

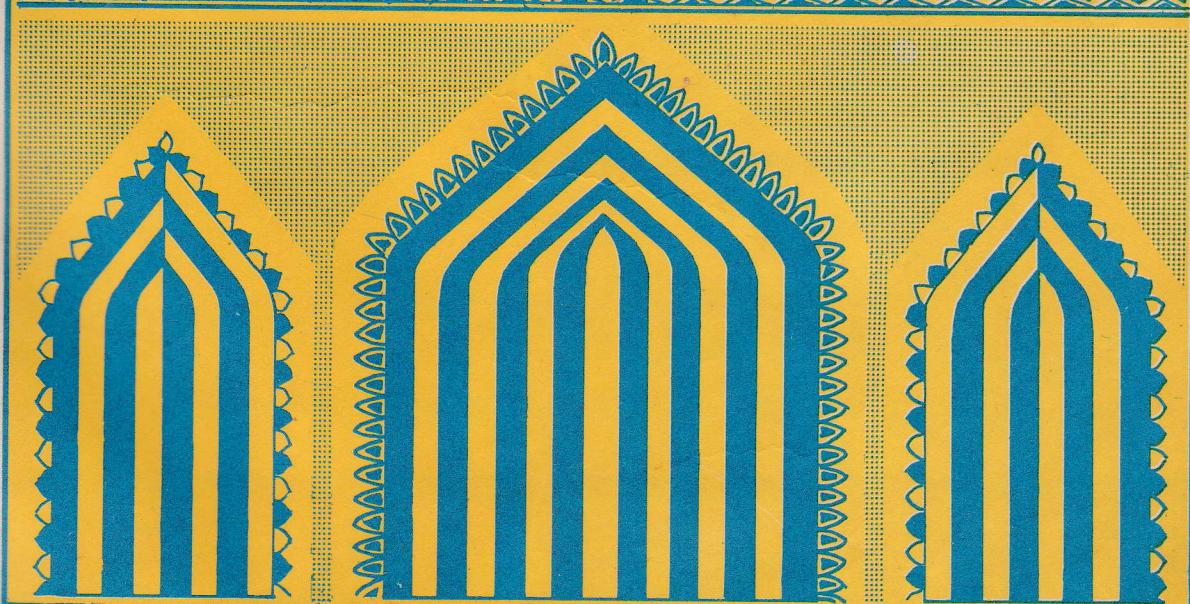
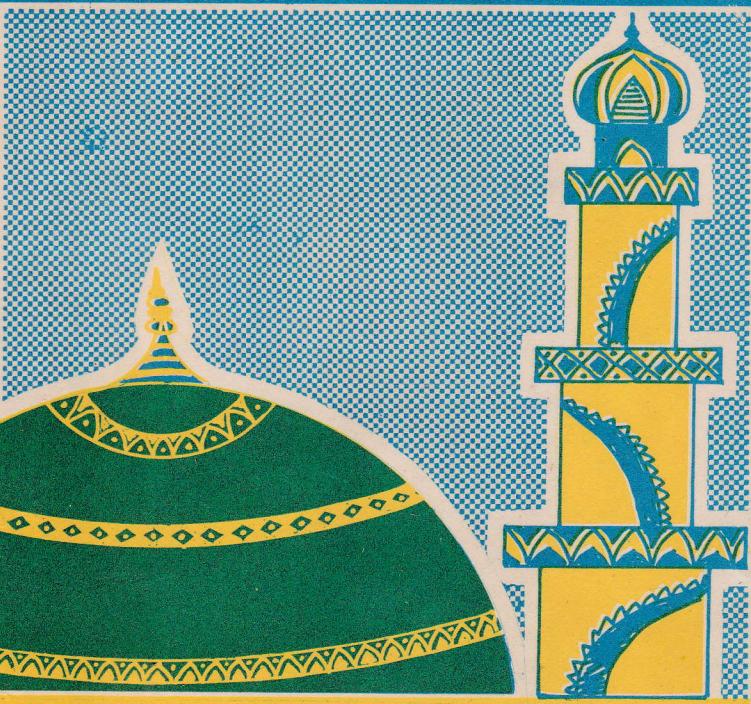
জ্ঞান ১৯৮৩

মাসিক

# জাগো মুজাহিদ

MONTHLY JAGO MUJAHID

আত্মা আনন্দ না শোকের স্মৃতি?  
বসনিয়াব চিঠি  
বিশ্বানবতা সাড়া দিবে কি?  
জীবন্ত কন্যা সমাধিষ্ঠ করার  
পৈশাচিক রীতি  
ও আজকের ভাবত  
বাঙালী সংস্কৃতির নামে  
জাহিলিয়াতের উত্থান



# ଜାଗ୍ରୋ ଘୁଜାରିଦ

# MONTHLY JAGO MUJAHID

প্রতিষ্ঠাতা:

শহীদ কমাণ্ডার আব্দুর রহমান ফারুকী (রাহঃ)

দ্বিতীয় বর্ষ ৮ম সংখ্যা

১৭ আষাঢ়-১৪০০

১০ মহর়ম-১৪১৩

୧ ଜୁଲାଇ - ୧୯୯୩

ପର୍ଷପୋଷକଃ

## କମ୍ବାଣ୍ଡର ମନଜର ହାସାନ

## সম্পাদকীয় উপাদান

উবায়দৰ রহস্যান খান নদুভী

সম্পাদকঃ

## ঘুফতৌ আদল হাই

ନିର୍ବାଚୀ ସମ୍ପାଦକঃ

## ଘନ୍ୟର ଆତ୍ମମାଦ

সহস্রাদকঃ

## ହବିବର ରହ୍ୟାନ ଖାନ

## ଯଫତୀ ଶଫିକର ବହୁମାନ

মূল্য : ৭ (সাত) টাকা মাত্র

যোগাযোগঃ

## সম্পাদক জাগো মজাহিদ

বি/৪৩৯ তালতলা

খিলগাঁও ঢাকা-১২১৬।

ফোনঃ ৪১৮০৭১

অশৰ্তা

জি.পি.ও.ব্রহ্ম নথুরাম ১০০০

માત્રા ૧૦૦

## সূচী পত্র

- |   |    |
|---|----|
| পাঠকের কলাম   | ১  |
| সম্পাদকীয়  | ২  |
| জীবন পাখেয়ঃ ধৈর্য সহনশীলতা ও উয়াদা পালন               | ৫  |
| আশুরা আনন্দ না শোকের সূতি?                              |    |
| আমীনুল ইসলাম ইসমতী                                      | ৭  |
| বসনিয়ার চিটিঃ  |    |
| বিশ্ব মানবতা সাড়া দেবে কি?                             |    |
| আদুল্লাহ আল-ফারাক                                       | ৯  |
| নারী স্বাধীনতা ও আমাদের সমাজ                            |    |
| প্রিপিপাল এ, এফ সাইয়েদ আহমাদ খালেদ                     | ১১ |
| জীবন্ত কন্যা সমাধিস্থ করার পৈশাচিক রীতি ও আজকের<br>ভারত |    |
| নাসীম রাফাত   | ১৫ |
| কমাণ্ডার আমজাদ বেলাল                                    |    |
| আল্লাহর সাহায্য আমি স্বচক্ষে দেখেছি                     | ১৮ |
| আমার দেশের চালচিত্রঃ                                    |    |
| বাঙ্গলী সংস্কৃতির নামে জাহিলিয়াতের উথান                |    |
| মুহাম্মাদ ফারাক হসাইন খান                               | ২১ |
| আমরা যাদের উত্তরসূরী                                    |    |
| হযরত বায়জীদ বেগমামীর ইল্মী কারামাত                     |    |
| জসীম উদ্দীন খান পাঠান                                   | ২৩ |
| ধারাবাহিক উপন্যাস                                       |    |
| মরণজয়ী মুজাহিদ   |    |
| মল্লিক আহমাদ সরওয়ার                                    | ২৭ |
| কবিতা   | ৩০ |
| প্রশ্নোত্তর   | ৩১ |
| নবীন মুজাহিদদের পাতা                                    | ৩৪ |
| বিশ্বব্যাপী মুজাহিদদের তৎপরতা                           | ৩৭ |

# পাঠকের কলাম



## পাঠক ফোরাম গঠনের আহ্বান মাননীয় সম্পাদক সাহেব!

মাসিক 'জাগো মুজাহিদ' ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ  
সংখ্যায় আহ্বান নৃশঙ্খ সাহেবের 'ময়দানে  
নামুন' শীরণামে লেখা চিঠিটির জন্য প্রথমে  
জানাই তাকে ধন্যবাদ।

চিঠিটিতে সুপরাম্ভ ও বৃক্ষিমত্তার পরিচয়  
পাওয়া যায়। আমাদের নিজের বলয় ও স্বার্থক  
ভবিষ্যত বিনিয়োগে এই চিঠিটি মাইল ফলক  
হতে পারে। তাঁর চিঠির বিষয় যথেষ্ট গুরুত্বের  
দাবী রাখে। তিনি আমাদেরকে আহ্বান জানিয়ে  
লিখেছেন: "আপনারা কমপক্ষে প্রত্যেক থানা  
(উপজেলা) থেকে একজন যোগ্য আলেম যিনি  
নিয়মতি 'জাগো মুজাহিদ' পড়েন, তাঁর নেতৃত্বে  
থানা ভিত্তিক সংগঠন গড়ে তুলুন। প্রত্যেক  
ইউনিয়নে এর শাখা প্রশাখা বিস্তৃত করে যোগ্য  
কর্মী তৈরীর চেষ্টা করুন, এভাবে 'জাগো  
মুজাহিদ'কে কেন্দ্র করে দেশ ব্যাপী একটি  
মহাবৃত্ত সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব বলে আমি  
মনে করি। যার কেন্দ্র হবে ঐ পত্রিকার  
কার্যালয়।"

তাঁর এই চিঠির মর্ম উপলব্ধি করে  
ইতিমধ্যে আমরা 'দেবিদার দাওয়াতুল হক  
পরিষদের' উদ্যোগে মাওলানা কেফায়াতুল্লাহ  
সাহেবের আহ্বানে গত ১২-৫-৯৩ ইঁতারিখে  
এক সভায় মিলিত হই। এই সভায় 'আহ্বান  
নৃশঙ্খ সাহেবকে' ধন্যবাদ জানিয়ে পত্রিকার  
পাঠকবৃক্ষি ও পাঠক ফোরাম গঠনের সিদ্ধান্ত  
নেয়াহয়। জাগো মুজাহিদের প্রত্যেক এজেন্টকে  
নিজ এলাকায় এইরূপ পাঠক ফোরাম গঠনের  
আহ্বান জানান হয়। নিজস্ব জন্মস্থান, সফল নেতৃত্ব  
এবং ব্রহ্মের সেনানী দেশ গড়ির লক্ষ্যে এর  
কোন বিকল্প নেই। এর সাথে সাথে অন্তি-  
বিলবে জাগো মুজাহিদ পত্রিকার সুর্যহৃৎ নতুন  
অফিস উদ্ঘোষনের সুসংস্কৰণ শুরুতে চাই। যে  
অফিস হবে ভবিষ্যৎ ইসলামী আন্দোলনের  
'কন্ট্রোল রুম' এবং ইসলামে নিবেদিত প্রাণ  
কর্মীদের আশা ভরসার স্থল।

আহ্বায়কঃ

মাওঃ কেফায়াতুল্লাহ  
দেবিদার দাওয়াতুল হক পরিষদ  
দেবিদার, কুমিল্লা।

## পাঠক ফোরাম গঠনের আহ্বানকে স্বাগত জানাই

আমি জাগো মুজাহিদের একজন নিয়মিত  
পাঠক। এর প্রতিটি সংখ্যা আমাকে দারুণ ভাবে  
আনন্দিত ও বিপুলভাবে উৎকৃত করে। প্রতি মাস  
শেষে পরারতী সংখ্যার জন্য তৃক্ষণ চাতকের  
ন্যায় অপেক্ষায় থাকি এর জন্যে।

জাগো মুজাহিদের প্রতিটি লেখা আমার  
কাছে ভীষণ ভাল লাগে। বিশেষতঃ সম্পাদকীয়,  
জনাব ফারাক হোসাইন খান সাহেবের রচিত  
"আমার দেশের চালচিত্র" ও মন্ত্রিক আহ্বান  
সরওয়ার সাহেবের ধারা—বাহিক উপন্যাস  
"মুরগজী মুজাহিদ" প্রত্তি লেখার কোন জুড়ি  
নেই। জাগো মুজাহিদ হাতে আসার সাথে সাথে  
একনিশ্চাসে আমি প্রথমে ওই লেখাগুলি পড়ে  
ফেলি। আমার প্রাণপ্রিয় লেখকদেরকে জানাই  
আন্তরিক মূরব্বারকবাদ।

জনাব আহ্বান নৃশঙ্খ সাহেব তাঁর চিঠির  
মাধ্যমে জাগো মুজাহিদকে কেন্দ্র করে যে পাঠক  
ফোরাম গঠন করার ব্যাপারে পাঠক বৃন্দের  
মতামত চেয়েছেন সে ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ  
একমত। এর মাধ্যমে গড়ে উঠবে নিজস্ব পরিবার  
ও ব্রহ্মের একটি বলয়। একে পাঠক কেন্দ্রিক  
সংগঠনও বলা যায়। আমরা এর সফলতা ও  
বাস্তবায়ন চাই। এই মহান উদ্যোগকে আমরা  
স্বাগত জানাই। পত্রিকার নিজস্ব পাঠকদেরকে  
নিয়ে গড়া এই সংগঠনের গুরুত্ব অপরিসীম।  
জাগো মুজাহিদের সকল নিরলস দক্ষ কলম  
সৈনিক, শুভাকাংবী ও পাঠক পাঠিকাদের প্রতি  
জানাই প্রাণ ঢালা অভিনন্দন ও আন্তরিক  
শুভেচ্ছা।

এম, এ, ওয়াহিদ নুমানী  
জামেয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া  
কাজির বাজার, সিলেট-৩১০০।

## কে আছেন কুরআনের বিধান বাস্তবায়ণে অকৃতভয় সৈনিক?

এই মাত্র জাগো মুজাহিদ মে সংখ্যা পড়ে  
শেষ করলাম। প্রতি সংখ্যার ন্যায় ফারাক  
হোসাইন খানের রচিত 'আমার দেশের চালচিত্র'  
কলাম খুবই ভাল লাগল। তাঁর এ ধরণের ক্ষুরধার

লেখনীর জন্যে তাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।  
আল্লাহ যেনো তাঁকে ইসলাম বিরোধী শক্তির  
বিরুদ্ধে অচেতন মুসলমানদের জিহাদী জঙ্গবায়  
উদ্বৃক্ত করার কলমকে আরও শক্তিশালী করে  
দেন। গত জানুয়ারী সংখ্যায় তিনি দেশে  
মুরতাদের প্রদুর্ভাব এবং তাদের ধর্মের ওপর  
ক্রমাগত আঘাত প্রতিরোধে মুসলমানদের  
আহ্বান জানিয়ে লিখেছেন, "কুরআনের বিধান  
মোতাবেক নিভীক চিত্তে ওদের যোগ পাওনা  
মিটিয়ে দিতে হবে, কে আছেন কুরআনের বিধান  
বাস্তবায়ন করার নিভীক সৈনিক?" যে সংখ্যায়  
তিনি আমাদের সমাজের ইসলামী আদর্শ বিচ্ছুত  
মুসলমানদের পাচাত্তের বিলাস প্রিয়তা ও  
অনুষ্ঠান সর্বৰ ধর্মীয় উৎসব পালনের অনুকরণে  
ঈদ উৎসবাপন করাকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন,  
এটা অনেকসমাইক উৎসব বৈ জন্য কিছু নয়।  
কিছু সংখ্যক দুর্নীতিপূর্বায়ন আমলা ও সরকারী  
কর্মকর্তা যারা মেহনতী গরীব দুঃহীনের সম্পদ  
পুরুক্ষের বিলাস বাসনে সিংশু, যাদের বোহে  
সিঙ্গাপুরে গিয়ে ইদের মাঝেটি না করলে  
পেজটিজু বাঁচে না তাদের লক্ষ্য করে চাবুকের  
কষাঘাত হেনেছেন। নৈতিকতা বর্জিত ফরজ  
পর্মাকে উপেক্ষাকারী ওই সব নায়িরা যারা  
প্রজাপতির ন্যায় পর—পূর্বৰে সামনে সৌলভ্যের  
ঢানা মেলে ধরতে না পারলে তৃষ্ণি পান না,  
তাদের ঘৃণ্য মানসিকতাকে নিস্দা জানিয়েছেন।  
তিনি যেন বিশেষ সকল তৌহিদী জনতাকে এসব  
বিদ্রোহ মানুষের কাছে সত্ত্বের আলো পৌছে  
দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলছেন, "কে আছে  
ভাই সত্ত্বের সাধক, সত্ত্বের ঝাওধানী যে  
সবদিকে ছালাবে সত্ত্বের মশাল?"

অতএব লেখকের আহ্বানের সাথে একমত  
যোষণা করে আহ্বান জানাই, আসুন আমরা  
ঐক্যবক্ত হয়ে বিদ্রোহ মানুষের কাছে সত্ত্বের  
আলো পৌছে দেই, ধর্মদ্রোহী ও সকল অশ্রীলতার  
বিরুদ্ধে ঘোষণা করছি সর্বাত্মক জিহাদ।

ইতি

শিকদার আবুল বাশার  
ইছামতি,  
তেরোখানা,  
বুলনা।

## সম্পাদকীয়

### গোড়ার গলদ দূর না করে বাজেট আর সংবিধান সুন্দর করেও লাভ হবে না

“রাষ্ট্রের সকল অসহায় দরিদ্র নাগরিক, এতিম বিধিবা ও ঝণগ্রস্তদের জীবন যাপনের সকল দায়-দায়িত্ব আমার উপর। যার কেউ নেই অমিই তার। যার সহায় বলতে কিছু নেই আমিই তার সহায়।”

বিশ্বের সর্বপ্রথম ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে মহানবী হয়েরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রথম নীতি নির্ধারণী কক্ষতার উদ্বোধনী অংশ এটি। ইসলামী সরকারের সংবিধান বা বাজেট রচনার দিক দর্শনও বলা চলে এটিকে। বাজেট প্রসঙ্গে আলোচনার শুরুতে এ পরিত্র তাবণের প্রথম অংশটি পাঠকের শুনে রাখা প্রয়োজন।

আগামী এক বছর সরকারের আয়-ব্যয়ের একটা পরিমিত হিসাবের নাম ‘বাজেট’—সরকারের অর্থ বিভাগ কত টাকা আয় করবে আর কত টাকা ব্যয় করবে এর একটা আলাজ। জনগণের কাছ থেকে পয়সা আদায় করে এবং বিদেশ থেকে ঝণ ও অনুদান সংগ্রহ করে সরকার তার তহবিল গঠন করবে আর নির্ধারিত খাতে এ শুলো ব্যয়িত হবে। যথেষ্ট শ্রম, মেধা ও সময় ব্যয় করে সরকারের অর্থমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্টরা (তাদের ধারণা ও সামর্থ অনুযায়ী) একটি বাজেট জাতীয় সংসদে পেশ করতে পেরেছেন। এ নিয়ে সংসদে আলোচনা হয়েছে। যারা বাজেটটা তৈরী করেছেন তারা এর প্রশংসন করেছেন আর যারা সরকারের বাইরে তারা করেছেন এর দুর্বলতা ও বিচ্যুতির সঙ্গাগ। কর ও খাজনার চাপ যাদের উপর বেড়েছে, যারা ভাট্টের আওতায় ঢুকেছেন তারা মন খারাপ করেছেন আর যে সব অঙ্গে ট্যাঙ্ক করেছে সেখানে একটু আনন্দও দেখা দিয়েছে। এই হলো আমাদের বাজেট। সরকারের শাসনব্যবস্থা, অর্থনীতি ও বাজেটের একটা বৃত্ত তৈরী হয়ে আছে। একটু উনিশ-বিশ হলেও এ বৃত্তের তেতরই সরকারকে হাত-পা ছুঁড়তে হবে। তা সরকার যে দলেরই হোক। আর এটাই হলো বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থার জড়ত্ব ও বন্ধ্যাত্মক ফল। একটা বিরাট ধরণের বিপ্লব ছাড়া এ জড়ত্ব ও বন্ধ্যাত্মক থেকে জাতি মুক্তি পাবে না।

গত ২২ বছর ধরে যারা একের পর এক এ দেশের ক্ষমতায় আসা যাওয়া করেছেন তারা কেউই এ জড়ত্ব এ বন্ধ্যাত্মক থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেননি। এর তিনিটি কারণ হতে পারেঃ (১) তারা বিষয়টি নিয়ে এভাবে চিন্তা করেননি। (২) এ ধরণের পরিবর্তন সাধনের সাহস, ক্ষমতা বা যোগ্যতা তাদের ছিল না। (৩) এ সব পরিবর্তন চিন্তাকে তারা নিজেদের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করেছেন এবং ইচ্ছে করে এসব উদ্যোগ এড়িয়ে চলেছেন।

আমাদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের বাজেট সর্বাঙ্গীন সুন্দর হওয়ার জন্য যে নীতিমালা অবলম্বন করা উচিত ছিলো তা কিন্তু সরকার ও বিরোধী দল কেউই বলেননি। আর এসব নীতিমালা এ দেশের জাতীয়তাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিকদের মাথায় খেলবার কথা নয়। কেননা, তারা তাদের রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থায় ইহুদী, খৃষ্টান ও নাস্তিকবাদীদের মূলনীতি অনুসরণ করে চলেছেন। মহান সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের নীতিমালা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারছে না। প্রিয়নবী হয়েরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শ এবং শিক্ষার প্রতি তাদের মোটেও মনোযোগ নেই। অতএব এরা কোন কালেই এ দেশের গণমানুষের জীবনে কল্যাণ ও শান্তি আনতে পারবে না। এ কথা আমরা হলফ করে বলতে পারলেও যতদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এ মহাসত্যটি উপলক্ষ্য না করবে ততদিন অবস্তার পরিবর্তনও আশা করা যায় না। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী রাষ্ট্রনীতির স্বার্থপর রীতি দিয়ে জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন কী করে সম্ভব? ভোগবাদী বাজেটে দরিদ্র জনগণের কী-ই বা আশা করার আছে? একটু ইশারা দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। বাংলাদেশের সংবিধানের শুরুর দিকেই রয়েছে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব, অধিকার ও সুযোগ সুবিধার কথা। সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যায় রয়েছে তাদের বেতন, ভাতা, চিকিৎসা ও ঐচ্ছিক অনুদানের ক্ষমতা সম্পর্কিত বর্ণনা। এরপর এসেছে মন্ত্রী, আমলা ও অন্যান্যের পাওনা দেওনার প্রসঙ্গ। বাজেটেও জনগণের কাছ থেকে নেয়া টাকায় গড়ে ওঠা রাজৰ বা আভস্তরণীয় সম্পদে গঠিত তহবিলের টাকা ব্যয় করার প্রধান ও পয়লা খাত হলো, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীবর্গ, সংসদ সদস্য ও আমলাদের বেতন ভাতাসহ অন্যান সুবিধাদী। সংবিধান ও বাজেটের কোথাও দেশের অনাথ, এতিম, বিধিবা, দুষ্ট, অসহায়, বাস্তুহারা, ভূমিহীন, পঙ্ক, বৃক্ষ, অথব, বেকার ও ঝণগ্রস্তদের জন্য সরাসরি কোন বরাদ্দের কথা উল্লেখ নেই। প্রত্যক্ষ কোন অংক নেই আয় রোজগারহীন কোন দরিদ্রের জন্য নির্দিষ্ট। যাদের সংখ্যা দেশের মূল জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ।

যে জনগোষ্ঠীটি পানি, গ্যাস, বিদ্যুত, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রচার মাধ্যম ও বিনোদন ইত্যাদি কোন দিক দিয়েই সরকারের কাছ থেকে কেনো ফায়দা ভোগ করার যোগ্যতা রাখে না, তাদের বাজেটে কি আসে যায়? শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ালে এদের কী? সহজ শর্তে স্বল্পসুন্দে ঝণ দিলেই বা এদের কী লাভ? সরাসরি এসব নাগরিককে অন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ না দেয়ার ব্যবস্থা করে যদি পৃথিবীর সেরা অর্থনীতিবিদেরা বছরব্যাপী গলদঘৰ্ষ হয়ে ইতিহাসের প্রেষ্ঠতম বাজেটিও বাংলাদেশের জন্য তৈরী করেন, তবুও এ শ্রেণীভুক্ত কোটি কোটি নাগরিকের কোনই লাভ হবে না।

পাঠক হয়ত চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। সব কিছু কেমন এলোমেলো মনে হচ্ছে। অনেকেই হয়ত ভাবতে শুরু করেছেন যে, দেশ-দুনিয়ার প্রচলিত সব রীতি নীতিকে এক কলমের খোচায় নাকচ করে দিয়েছে জাগো মুজাহিদ। কিন্তু বিষয়টি আসলে এমন নয়। আমরা কেবল সত্য ও নির্ভুল রাষ্ট্রনীতি এবং মানবতাপন্থী ও নিষ্ঠাৰ্থ অর্থনীতির প্রতি আমাদের শাসক ও রাজনীতিবিদদের আহবান জানাচ্ছি। যে রাজনীতি শেখার জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ শুলোতে চেয়ে বেড়ানোর প্রয়োজন নেই। এক কপি কুরআন আর হাদীস ও সীরাতের দু'টো গ্রন্থই যথেষ্ট। তবে প্রশ্ন হলো একটাই যে, জাতির কর্ণধারেরা কি এ ভাবে চিন্তা করতে রাজী হবেন? সম্পাদকীয়ের শুরুতে উল্লেখিত প্রিয় নবীর তাৎপর পরিত্র বাণীগুলোর সাথে কি তারা তাদের সংবিধান ও বাজেটের চরিত্রটা তুলনা করবেন?

# ‘জাগো মুজাহিদ’—এর নিয়মাবলী

## ১. এজেন্সী

- ★ সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্সী দেয়া হয়।
- ★ এজেন্সীর জন্য অগ্রীম বা জামানত পাঠাতে হয় না।
- ★ অর্ডার পেলেই পত্রিকা ভিপিতে পাঠানো হয়।
- ★ যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।
- ★ অবিক্রিত কপি ফেরৎ নেয়া হয় না।
- ★ ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

## ২. বার্ষিক গ্রাহক টাঁদা (রেজিস্ট্রি ডাক)

★ বাংলাদেশ	একশো চাল্লিশ টাকা
★ ভারত ও নেপাল	ছয় ডলার
★ পাকিস্তান	আট ডলার
★ মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা	পনের ডলার
★ মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	পনের ডলার
★ ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া	আঠার ডলার

সাধারণ ডাকে গ্রাহক করা হয় না।

## ৩. গ্রাহক টাঁদা পাঠাবার নিয়ম

- ★ গ্রাহক হবার জন্য ব্যাংক ড্রাফট ও চেক ‘মাসিক জাগো মুজাহিদ’ নামে পাঠাতে হয়। দেশের অভ্যন্তর থেকে মানি অর্ডার পাঠাতে হবে নিম্নের যোগাযোগের ঠিকানায়।

### ব্যাংক একাউন্ট

মাসিক জাগো মুজাহিদ  
কারেন্ট একাউন্ট নং- ৫৩১৯  
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ  
লোকাল ব্রাঞ্চ, মতিঝিল, ঢাকা

### সব রকম যোগাযোগের ঠিকানা

মাসিক জাগো মুজাহিদ  
বি-৪৩৯, তালতলা,  
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।

## ধৈর্য, সহনশীলতা ও ওয়াদা পালন

**সহনশীলতা ও ক্ষমাঃ রাসূল (সা�)-** এর সবর, সহনশীলতা ও ক্ষমার শুণাবলী নবুয়তের মহোত্তম শুণাবলীর অন্যতম। হাদীসে আছে, রাসূলগ্রাহ (সা�) কখনো ব্যক্তিগত ব্যাপারে বা ধনৈশ্বরের খাতিরে কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ নেননি। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর হালাল করা জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করেছে আল্লাহর ওয়াষ্টেই তিনি সে ব্যক্তির নিকট থেকে প্রতিশোধ নিয়েছেন। রাসূল (সা�)-এর সর্বাধিক কঠিন সবর ছিল ওহু যুক্তের সময়ে, যখন কাফেরো তাঁর সাথে যুক্ত ও মোকাবিলা করে এবং শুরুতর কষ্ট দেয়। কিন্তু তখন তিনি তাদের কেবল সরব ও ক্ষমা করেই ক্ষান্ত হননি, বরং তাদের প্রতি মেহ ও অনুকূল্পা প্রদর্শন করে তাদের এ মূর্খতা প্রসূত কাজকে ক্ষমা সাব্যস্ত করে বলেছেন, “হে আল্লাহ! আমার সম্পদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করুন। কেননা, ওরা অজ্ঞ।”

মুক্তির কাফেরো একুশ বছর পর্যন্ত রাসূল (সা�) ও তাঁর নাম উচ্চারণকারীদের ওপর নির্যাতন চালায়। জুপুর ও নির্যাতনের এমন কোন পদ্ধতি ছিল না যা ওরা প্রয়োগ করেনি। অবশেষে ওরা তাঁকে বাস্তুভিটা ও স্বদেশ ত্যাগে বাধ্য করে। কিন্তু মুক্তি বিজয়ের পর তারা পুরোপুরি ভাবে রাসূলে আকরাম (সা�)-এর দয়া ও কৃপার পাত্র হয়ে দাঢ়ায়। তখন তিনি তাঁর একটি আঙ্গুলির ইশারায় ওদের সবাইকে রক্ষণাত্মক ভাসিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু বাস্তবে হয়েছে তার বিপরীত।

এককালের দোদণ্ড প্রতাপশালী কুরাইশ সদারেরা অনুশোচনার ভাবে মাথা নত করে রাসূল (সা�)-এর সামনে দণ্ডয়ান। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ “তোমরা আমার নিকট কি রূপ আচরণ প্রত্যাশা কর?”

ওরা সমিলিত কঠে উত্তর দিলঃ হে

সত্যবাদী। হে বিশ্বস্ত! আপনি আমাদের সত্ত্বান্ত ভাই, সত্ত্বান্ত ভাতুপুত্র। আমরা সর্বদাই আপনাকে দয়ালু রূপে পেয়েছি।

রাসূল (সা�) বললেনঃ অদ্য আমি তোমাদের তাই বলব, যা হ্যরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাতাদের বলেছিলেন। তিনি বললেনঃ “তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। যাও, আজ তোমরা! সকলেই মুক্ত।” (শেফা-ইবনে হেসাম)

**ধৈর্য ও স্তৈর্যঃ হ্যরত আনাস (রাঃ)**  
বর্ণনা করেন, রাসূলগ্রাহ (সা�) বলেন, “আল্লাহর পথে আমাকে যত পরিমাণ ভয় দেখানো হয়েছে, তত ভয় অন্য কাউকে দেখানো হয়নি। আল্লাহর পথে আমাকে যত পরিমাণ নির্যাতিত করা হয়েছে তত নির্যাতিত অন্য কাউকে করা হয়নি। একবার ত্রিশটি দিবারাত্রি আমার এমন অভিবাহিত হয়েছে, যখন আমার ও বেলালের জন্যে এমন কোন আহার্য ব্যবস্থা ছিল না যা কোন প্রাণী খেতে পারে, সেই বক্তু ছাড়া যা বেলাল তার বগলে লুকিয়ে রেখেছিল। (মা’আরেফুল হাদীস, শামায়েল)

একবার রাসূল (সা�) তাওহীদের বাণী প্রচারের জন্যে হ্যরত যায়েদ ইবনে হারেসকে সাথে নিয়ে পদব্রজে তায়েক পৌছেন এবং স্থেনকার লোকদের ইসলামের দাওয়াত দেন। ওরা ক্ষিণ হয়ে তাঁর ওপর নির্যাতন চালাতে উদ্যত হয়। তায়েফের সদারেরা শহরের বাথটে হেঝে ছোকরাদের তাঁর বিরুদ্ধে লেপিয়ে দেয়। ফলে তারা রাসূল (সা�) যখনই লোকদের ইসলামের পথে আহবান করতেন তখনই তারা তাঁকে লক্ষ্য করে তুমুল প্রস্তর নিক্ষেপ করত, যাতে তিনি রক্তাক্ত হয়ে যেতেন। রক্ত বয়ে বয়ে জুতায় জমাট হয়ে যেত এবং ওজুর জন্য জুতা থেকে পা বের করা কঠিন হত। একবার উশুঙ্গুল বালকেরা নবী করীম (সা�)-কে

এত গালিগালাজ করলো এবং ক্রুদ্ধ হয়ে এমনভাবে তাড়া করলো যে, তিনি এক গৃহের আঙ্গিগায় আগ্রহ নিতে বাধ্য হলেন।

এমনি ভাবে অন্য একদিন তিনি দুষ্ট বালকদের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান। হ্যরত যায়েদ (রাঃ) তাঁকে নিজের পিঠে বহন করে শোকালয়ের বাইরে নিয়ে যান। অতপর চোখে মুখে পানির ছিটা দিলে তিনি জ্ঞান ফিরিপান।

এ সফরে তিনি কেবল কষ্ট ও নির্যাতনই সহিলেন। একটি লোকও ইসলাম গ্রহণ করল না। এহেন দুঃখ ও বেদনার মুহূর্তেও নবী করীম (সা�)-এর অন্তর আল্লাহর মাহাত্মা ও মহয়তে পরিপূর্ণ ছিল। এমন নির্যাতন তোগ করেও তায়েফ থেকে ফিরে আসার পথে তিনি বললেন, “আমি ওদের ধূংসের জন্য দোয়া করব কিরূপে? ওরা ইসলাম গ্রহণ না করলেও আশা করা যায় যে, ওদের ভবিষ্যত বংশধরেরা অবশ্যই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।” (সহীহ মুসলিমঃ কিতাব-রাহমাতুল্লিল আলামিন)

**অঙ্গীকার পালনঃ রাসূলগ্রাহ (সা�)**  
তাঁর সকল আচরণ ও অভিব্যক্তিতে করীরা ও সঙ্গীরা গোনাহ থেকেও নিষ্পাপ ছিলেন। ওয়াদার খেলাফ করা অথবা কারো পক্ষ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা তার জন্য সংস্কৰণেই ছিল না। না ইচ্ছাকৃতভাবে, না ভুলগ্রহণে, না সুস্থ অবস্থায়, না অসুস্থ অবস্থায়, না রাগাভিত অবস্থায়। (নশরুত-তীব)

বদর যুক্তের সময় মুসলমানদের সংখ্যা খুবই সামান্য ছিল। এ মুহূর্তে একজন লোক পাওয়াও ছিল আনন্দের বিষয়। হ্যাইফা ইবনে এয়ারমান (রাঃ) ও আবু হিয়াল (রাঃ) নামক দু’জন সাহাবী রাসূল (সা�)-এর খেদমতে হাজির হলেন এবং আরজ (১৭ পৃঃ দেখুন)

## দু' ফেঁটা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ  
আল্লাহ তায়ালার নিকট দু'টি ফেঁটা  
যত প্রিয় অন্য কিছুই তাঁর নিকট তত  
প্রিয় নয়।

এক—ওই অশ্রু ফেঁটা যা আল্লাহর  
ভয়ে চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে।  
দ্বিতীয়—ওই রক্ত ফেঁটা যা আল্লাহর  
পথে ঝরান হয়।

— তিরমিজী শরীফ

সৌজন্যেঃ

আল—ফারুক ইসলামিক ফাউণ্ডেশন  
শিক্ষা, সংস্কৃতি, দাওয়াত, গবেষণা, প্রচার ও জনসেবামূলক  
ব্যতিক্রমধর্মী একটি প্রতিষ্ঠান

বি-৩৮১-তালতলা, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯

ফোনঃ ৪১৮০৩৯

# আশুরা আনন্দ না শোকের স্মর্তি?

আমীনুল ইসলাম ইস্মতী

মহানবী (সা:)—এর আহলে বায়িত—এর প্রতি তালোবাসা রাখা ও সম্মান প্রদর্শন করা দ্বিমানের অঙ্গ। তাদের ওপর কৃত পৈশাচিক ও নির্দয় অত্যাচারের কাহিনী ভূলে যাওয়ার মত নয়। নির্যাতিত হয়রত হোসাইন (রাঃ) ও তাঁর সাথীদের মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক শাহাদাতের ঘটনা যার অন্তরে দুঃখ—বেদনা ও সহানুভূতির উদ্বেক করে না তাকে পাষাণ ছাড়া আর কি বলা যায়? তবে তাঁদের প্রতি সত্যিকার প্রীতি ও পূর্ণ মাত্রায় সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁদের ওপর চাপিয়ে দেয়া বিপদে দরদ প্রদর্শনের অর্থ এই নয় যে, সারা বছর আমোদ প্রমোদে কাটিয়ে দেবে, একটি বারের মত কথনও তাদের কথা বলবে না আর শুধুমাত্র আশুরার দিনে শাহাদাতের ঘটনা ঘৰণ করে অঞ্চ করাবে ও শোক প্রকাশ করবে আর তায়িয়া প্রদর্শনী ও খেল—তামাসা করবে। বরং সত্যিকার সহানুভূতি ও তালোবাসা হচ্ছে এটাই যে, যে মহান লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে তাঁরা এ কুরবানী দিয়েছেন সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ সামর্থান্যায়ী ত্যাগ ও কুরবানী দেয়া, তাদের চারিত্রিক গুণবলী অর্জন ও আমলের অনুসূরণকে দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য সৌভাগ্য মনে করা। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, শিয়া সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনার স্মৃতিবহ অবিমিশ্র শোকের দিবস বলে পরিচিত তায়িয়া প্রদর্শনী, মর্সিয়া ও ক্রন্দনয়ত এক প্রেরণীর লোকের হাবভাব দর্শনে একথাই মনে হয় যে, কারবালায় হয়রত হোসাইন (রাঃ)—এর শাহাদাতই যেন এই দিবসের একমাত্র ঘটনা। কেউ কেউ আবার হয়রত হোসাইন (রাঃ)—এর

শাহাদাতের ঘটনার জন্য আশুরা দিবসে রোয়া রাখা ও পরিবার পরিজনের জন্য মুক্ত হস্তে ব্যয় করা সংক্রান্ত বর্ণনার সমাপ্তোচনা করে বলেন যে, নবী দৌহিত্রের শাহাদাতে এই দিবসটি অবিমিশ্র শোক পালনে অতিবাহিত করা উচিত। রোয়া রাখা, পরিবার পরিজনের জন্য মুক্ত হস্তে খরচ করা, দান খয়রাত করা প্রভৃতির মাধ্যমে উৎকুল্পন মনেরই অভিব্যক্তি ঘটে। এই শোক ও বিষাদ অবিদিবসে একেব করা অনুচিত। কিন্তু তাদের এ ধরণ সম্পূর্ণ অঙ্গীক ও ভাস্ত। বরং সত্য ও প্রকৃত কথা হলো, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী দৌহিত্রের শাহাদাতের জন্য এমনই একটি মহিমান্বিত দিনকেই নির্বাচন করে নিয়েছেন, যা মাহাত্ম্যের দিক হতে আবহামান কাল হতেই শ্রেষ্ঠ, যেন তাঁর মর্যাদা আরো বৃক্ষি পায় এবং তিনিও শাহাদাত প্রাপ্ত সাহাবীগণের মর্যাদায় অভিস্কৃত হন। কেননা, প্রথমতঃ আশুরা বিশ্ব ইতিহাসের চিরস্মত মাইল ফলক। মানব ইতিহাসের যুগান্তকারী অনেকে ঘটনার সাক্ষী এই আশুরা। এই দিনে আল্লাহ তায়ালা স্থীয় অনুগ্রহে বহুনবী রাসূলকেই বিপদ মুক্ত ও জয়যুক্ত করেছেন এবং চির দুশ্মনকে ধ্বংস করে তাদেরকে সমাসীন করেছেন উচ্চ মর্যাদায়। মানব জাতির আদি পিতা হয়রত আদম (আঃ)—কে আল্লাহ পাক আশুরার দিনেই তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করেছেন এবং এ দিনেই তাঁর তাওবা করুল করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় আদম বলে পরিচিত হয়রত নূহ (আঃ) সাড়ে নয়শত বছর যাবৎ দীন ইসলামের তাবলীগ করার পরও যখন তখনকার মানুষ আল্লাহ তায়ালার বিধি—নিষেধ পালনে অবীকৃতি জানায় তখন নেমে আসে আল্লাহর

গজব। হয়রত নূহ (আঃ)—এর সম্প্রদায় হয় কোপঘষ্ট। এক মহা প্লাবনে তদানিন্দন পৃথিবীর মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, রক্ষা পায় শুধু তারা যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে হয়রত নূহ (আঃ)—এর তরীকে আরোহণ করে। এই তরী জুনী পাহাড়ের পাদদেশে এসে থামে এই ঐতিহাসিক আশুরার দিনে। আর এই দিনেই হয়রত ইবরাহিম (আঃ) ভূমিষ্ঠ হন এবং এই দিনেই তিনি আল্লাহর খলীল তথা বন্ধুর মর্যাদা লাভ করেন, এই দিনেই তিনি নমরূদের অঞ্চ কৃণ হতে মুক্তি লাভ করেন। হয়রত ইদরিস (আঃ)—কে যখন তাঁর ধূর্ত সম্প্রদায় মেরে ফেলার ফল্দি আঁটে তখন আল্লাহ পাক হয়রত ইদরিস (আঃ)—কে তাদের কোপানল থেকে এই আশুরার দিনেই উর্ধ্ব জগতে তুলে নেন এবং তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। হয়রত সুলাইমান (আঃ)—কে এই দিনে ছিন ও ইনসান তথা মানব—দানব জগতের রাজত্ব প্রদান করেন। ঘটনা ক্রমে একবার হয়রত সুলাইমান (আঃ) তাঁর হাতের আঁটি হারিয়ে ফেলেছিলেন, ফলে তিনি সাময়িক ভাবে রাজ্য হারা হন। এই ঐতিহাসিক আশুরার দিনেই আল্লাহ পাক তাঁর হত রাজত্ব পুনরায় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এ দিনেই হয়রত ইউসুফ (আঃ)—এর সঙ্গে সুনীর্ধ চালিশ বছর পর তাঁর পিতা হয়রত ইয়াকুব (আঃ)—এর সাক্ষাত ঘটে। আর এদিনেই সর্বপ্রথম হয়রত মুসা (আঃ)—এর সাথে আল্লাহ তায়ালার কথোপকথন হয় এবং তাঁর প্রতি তাওরাত অবতীর্ণ করেন, মিথ্যা খোদায়ীর দাবীদার অত্যাচারী ফেরাউনের কবল থেকে আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতে হয়রত মুসা (আঃ) বনী ইসরাইল কে মুক্ত করেন, আর

ফেরাউন সদলবলে নীল নদে ডুবে মারা যায়। হ্যরত ইউনূস (আঃ) ইরাকের দজলা নদীতে নিমজ্জিত হলে এক বিরাট মৎস্য তাকে উদরে পুরে নেয়। আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরতে এই আশুরার দিনেই তিনি মৎস্যের উদর থেকে নাজাত লাভ করেন। এমনি আরও বহু ঐতিহাসিক ঘটনা এই আশুরার দিনে ঘটেছে। যেমন এই দিনেই হ্যরত দাউদ (আঃ)-এর তাওবা কবুল হয় এবং তিনি নিষ্পাপ বলে চিন্তা মুক্ত হন। হ্যরত ইসা (আঃ) ভূমিষ্ঠ হয়েছেন এই আশুরার দিনে এবং তাকে আল্লাহ পাক আসমানে তুলে নিয়েছিলেন এই দিনেই।

দ্বিতীয়তঃ এই দিনের করণীয় কাজে আল্লাহ তায়ালা বান্দার জন্য প্রভৃত কল্যাণ ও সীমাহীন সওয়াব নির্ধারিত করে রেখেছেন। আল্লাহর বাণীঃ “আল্লাহর নিকট মাসের হিসেব হল মাস বারটি। তন্মধ্যে চারটি মাস অতি মর্যাদাপূর্ণ।” (তাওবা: ৩৬) মুহাররম মাস উচ্চ সম্মানিত মাসগুলোর অন্যতম এবং আশুরার দিন তারাই অস্তরভূত। হাদীসে এসেছে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্দাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ “যে ব্যক্তি মুহাররম মাসে আশুরার রোয়া (চাঁদের দশম তারিখে) রাখতে, সে ব্যক্তিকে দশ হাজার ফিরিশতা, দশ হাজার শহীদ এবং দশ হাজার হজ্জ ও উমর-হকারীর সওয়াব প্রদান করা হবে। সে ব্যক্তি এ দিনে কোন ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাবে আল্লাহ তায়ালা তার মাথার প্রতিটি চুলের পরিবর্তে জানাতে তাঁকে একটি করে মর্যাদা দান করবেন। যে ব্যক্তি আশুরার দিন সন্ধিয়ায় কোন রোয়াদারকে ইফতার করাবে, সে যেন সমস্ত উচ্চতে মুহার্মাদিয়াকে ইফতার করাল এবং সকলে তৃতীয় সহিত তোজন করাল। তখন সাহাবাগণ (রাঃ) আরয় করলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ কি আশুরার দিনকে সর্বাদিক ফয়লিত দান করেছেন? নবী করীম (সাঃ) এতে

ইতিবাচক উত্তর প্রদান করেন।” হ্যরত ইবনে আব্দাসের (রাঃ) অপর বর্ণনায় আছে যে, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ “যে ব্যক্তি আশুরার রোয়া রাখতে, আল্লাহ তাকে ষাট বছর দিবসতর রোয়া ও রজনীতর ইবাদতের সওয়াব দান করবেন।” (তিবরানী)

হ্যরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) একদা অসুস্থতা বশতঃ আশুরার রোয়া রাখতে না পারায় রোদন করতে করতে বলেন যে, “আমি আজ অসুস্থতার জন্য রোয়া রাখতে পারলাম না, অথচ আমি নিজ কানে শ্রবণ করেছি, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ “যে ব্যক্তি আশুরার দিন রোয়া রাখতে দোয়খের আগুন তাকে কখনও স্পর্শ করবে না।” (মাজালিসুল আবরার)

‘জা-লীসুন নাসিহান’ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ “যে ব্যক্তি নিজের জন্য দোয়খের আগুন হারাম করতে চায়, সে যেন মহররম মাসের নফল রোয়া রাখে।” রাসূল (সাঃ) আরও ইরশাদ করেছেনঃ “যে ব্যক্তি আশুরার দিন গোসল করবে, একমাত্র মৃত্যুকালীন রোগ ছাড়া অপর সকল রোগ হতে সে বেঁচে থাকবে। যে ব্যক্তি আশুরার দিন অসম্মত (সুরমা তৈরীর পাথর বিশেষ)-এর সুরমা ব্যবহার করবে পূর্ণ বছর ব্যাপী সে চক্ষু রোগ হতে মুক্ত থাকবে। যে ব্যক্তি আশুরার দিন কোন রংগু ব্যক্তিকে দেখতে গেল সে যেন সমস্ত আদম সন্তানের রোগ শুণ্য করল।”

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এ দিবসের প্রভৃত কল্যাণ ও সীমাহীন তাৎপর্য সম্পর্কে অবগতির পর এই কথা ডালভাবে প্রতিভাত হয় যে, শিয়া সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে “হায় হোসাইন! হায় হোসাইন। বলে বুক চাপড়ানো, মর্সিয়া, ক্রন্দন ও তায়িয়া প্রদর্শনের জন্য আশুরার দিবস নয়।

তৃতীয়তঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) ও তাবেয়ীগণ নিঃসন্দেহে আমাদের তুলনায়

হ্যরত হোসাইন (রাঃ)-এর ঘনিষ্ঠিতর ছিলেন। নবী করীম (সাঃ)-এর শিক্ষা অনুসারে তারাই যখন দিবসটিতে রোয়া রেখেছেন এবং পরিবার-পরিজনের জন্য মুক্ত হতে ব্যয় করে আনন্দ প্রকাশ করেছেন, সেখানে ঐসব হর্ষের দিককে পরিত্যাগ করে হ্যরত হোসাইন (রাঃ)-এর শোকে এত বড় একটি মহিমারিত দিবসকে নিষ্ক বিষাদ দিবসে পরিনত করার যৌক্তিকতা কোথায়? আমরা কি সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও তাবেয়ীগণের তুলনায় হ্যরত হোসাইন (রাঃ)-এর অধিকতর ঘনিষ্ঠ? তাঁদের চেয়ে তাঁর প্রতি কি আমাদের দরদ বেশী?

চতুর্থতঃ যদি হ্যরত হোসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতের কারণে এই দিবসটিকে শোক দিবস ক্লাপে পালন করা হয়, তবে সোমবারকেও শোক দিবস ক্লাপে পালন করতে হয়। কেননা এই দিন মহানবী (সাঃ)-এর এবং হ্যরত আবু বকর (রাঃ)-এর ইত্তেকাল হয়। কিন্তু তা কি কেউ করে? বরং সোমবার দিনে মুসলিম জাতি আনন্দ চিন্তে রোয়া রাখে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নানাবিদ পুণ্যের কাজ বেশী পালন করে। কেননা এই দিনে রোয়া রাখার ফয়লিত এবং সোমবার বান্দার আমল আল্লাহর সমীপে উত্থাপিত হওয়ার কথা হাদীসে রয়েছে। তাই আশুরা শোকের আরক নয়, নয় বিষাদের শৃতি। আশুরা হল হর্ষ শারক, আমোদ প্রমোদের শৃতি। আশুরাকে শোক দিবস ক্লাপে পালন করাই অযৌক্তিক। হর্ষ দিবসক্লাপে পালন করাই অধিকতর শৃতিমুক্ত। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নিজেদের মনগড়া আচার-আচরণ ও প্রথা পদ্ধতি পরিত্যাগ করে তাঁর রাসূলের সুন্নাতকে পুরোপুরি অনুসরণ করে চলার তাওফিক দান করছন।

বসনিয়ার চিঠি:

# বিশ্বমানবতা ফাড়া দিবে কি?

আনন্দপুরাহ আল-ফারাক

সভ্যতাগবী ইউরোপের বুকে মানবতার মহা দুশ্মন সার্বদের বন্দী শিবিরের ভয়ঙ্কর নির্যাতন ভোগ করছেন এমন কয়েকজন বসনীয় মুসলিম মহিলা বন্দী শিবিরের নারীকীয় লোহমুর্ক-পরিবেশের বর্ণনা দিয়ে বিশের মুসলিম দেশসমূহের উদ্দেশ্যে একখন চিঠি লিখেছেন। সম্পত্তি বসনীয় মুসলিম মহিলাদের দুরবস্থা সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণকে অবগত করার জন্য তাঁরা বাংলাদেশের মুসলমান, মুসলিম সংগঠন ও সংস্থাসমূহ, বাংলাদেশের সরকার, পার্লামেট সদস্য এবং সেনাবাহিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার অনুরোধ জানিয়ে আমাদের কাছে মর্মস্পর্শী ভাষায় লেখা তাঁদের একখন চিঠি পাঠিয়েছেন। নিচে চিঠির হৃষ অনুবাদ তুলে ধরা হলঃ

“সার্বদের ধর্ষণ ক্যাম্পের মুসলিম মহিলাদের পক্ষ থেকে—

হে মুসলিম রক্ত বহনকারী ভাই ও বোনেরা! ক্ষণিকের জন্য একটি দৃশ্য কল্পনা করছন। অস্ত্রসজ্জিত দু'পাওয়ালা মানবাকৃতির কিছু জানোয়ার চরিত্রের লোক আপনার ঘরে প্রবেশ করে আপনার বোন বা স্ত্রীকে জোর করে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গেল। ক্যাম্পে ২০/ ৩০ জন তাঁকে পালাক্রমে ধর্ষণ করতে থাকল। তিনি আর্টনাদ করছেন ও পশুদের কাছ থেকে রেহাই পেতে চাইছেন। কিন্তু কে শোনে তাঁর আর্টনাদ? পশুরা আরও উন্মত্ত হয়ে উঠছে। এই ভদ্রমহিলা শুধু একজন গৃহবধুই নন, তিনি একজন পবিত্রা মুসলিম মা-ও। আর তার ওপর মানসিক ও শারীরিক নিপীড়নের এটাই একমাত্র কারণ, একমাত্র অপরাধ।

আর একটি দৃশ্য। একটি সাত বছরের নিষ্পাপ মেয়েকে তার পিতার সামনেই

নরপতিরা ধর্ষণ করছে। এসব ঘটনা পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়। আরা-আমা বা স্বামীর সামনেই তাঁদের মেয়ে বা স্ত্রীকে নরপতিরা বিবর্ত করে পালাক্রমে নির্যাতন করে যাচ্ছে, যতক্ষণ এ আজাব ভোগ করে তার মৃত্যু না হয়। যারা বেঁচে যায় তারা ধর্ষণ ক্যাম্পে প্রতিটি মৃহূর্ত আতঙ্কে কাটায়। মনে মনে মৃত্যু কামনা করে, এই দোজখ থেকে মুক্তির পথ খোঁজে।

এই সব ঘটনা কোন বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। সার্বদের ধর্ষণ ক্যাম্প ও বন্দী শিবিরে অহরহ এ ঘটনা ঘটছে। মা ও স্ত্রীকে সন্তানের চোখের সামনে ধর্ষণ করে তাঁদের শরীরে পেটোল চেলে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। বসনিয়ার পরবর্তী মুসলিম প্রজন্মকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য সার্বরা ব্যাপক হারে মুসলিম শিশুদের হত্যা করছে। ওরা মসজিদের মেঝেতে শিশুদের আছড়ে মারে। এসব শিশু যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় আর্টনাদ করে তখন সার্ব পশুরা ঠাট্টা করে বলে “ওদের চিংকার আর আজানের ধনি একই রুকম।”

বন্দী শিবিরে শিশুদের হাতে বিষের পেয়ালা অথবা বিষমাখা রুটি তুলে দিয়ে তাঁদের নিজ হাতে তা গলাধঃকরণ করতে বাধ্য করা হয়। সার্ব পশুরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব শিশুকে ধীরে ধীরে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার দৃশ্য উপভোগ করতে থাকে। বন্দী শিবিরে আটক গর্ভবতী মুসলিম মহিলাদের লাইন দিয়ে শুইয়ে তাঁদের পেট কেটে নবজাতককে বের করে নেয়া হচ্ছে। সব শিশুকে মায়ের সামনেই বেয়নেট দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়। অথবা আছড়ে মেরে ফেলা হয়।

আমরা দেখেছি, একজন নয়, হাজার হাজার মুসলিম কিশোরী-যুবতীকে ধর্ষণ

শেষে তাঁদের শুল কেটে দেয়া হয়েছে, যাতে তাঁরা ভবিষ্যত বংশদরদের দুধ না খাওয়াতে পারে। মুসলিম যুবক-কিশোরদের লিঙ্গ কেটে দেয়া হয়েছে, যাতে তাঁরা সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম না হয়। সার্ব বন্দী শিবিরে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি মুসলিম পুরুষদের বধ্যভূমিতে দৌড় করিয়ে জল্লাদ দিয়ে তাঁদের মাথা ভুল্টিত করে দেয়া হয়েছে। তাঁদের মৃত লাশের মুখে মদ ঢেলে দেয়া হয়েছে, বুকে ক্রশ একে দিয়ে পরপরে যিশুর কৃপা লাভে ধন্য করানোর কোশেশ হয়েছে। ওদের ভাষায় এটা করলে নাকি ইউরোপ শয়তানদের (মুসলিমদের) কবল থেকে পবিত্র হবে, যিশু খৃষ্ট খৃশি হবে এবং পরপরে স্বর্গ লাভকরা যাবে। খৃষ্টান চার্চ থেকে সার্বদের দীক্ষা দেয়া হয় “মুসলিমানরা খৃষ্টান ধর্মের বড় শত্রু। ওদের কবল থেকে ইউরোপকে মুক্ত রাখা ধর্মীয় পবিত্র দায়িত্ব।” সার্বদের জাতীয় সংগীতে মুসলিম গগহত্যাকে উৎসাহিত করে বলা হয়েছে, “কে আছে মুসলিম রক্তপানকারী, আমি আছি প্রথম কাতারো।” আর এসব ইঙ্গনে উন্নত সার্বরা মুসলিমানদের হত্যা করে তাঁদের রক্ত পান করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাঁদের কলিজা ও মগজ বের করে কুকুরকে দিয়ে খাইয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চেয়েছে।

ধর্ষণ শিবিরে মুসলিম মহিলাদের ওরা গব করে বলছে, তোমরা এবার সার্ব শিশু জন্ম দিয়ে সার্বদের সংখ্যা বৃদ্ধি কর। এসব সার্ব শিশু দিয়ে আমরা মুসলিমানদের বংশ নির্মূল করবো। যখন কোন মহিলা মাসের পর মাস সার্বদের শিবিরে আটক থাকার পর কোন সার্ব শিশু প্রসব করে তখন তাঁরা আনন্দে উল্লাস করতে থাকে, যেমন মানুষ সার্কাস দেখে উল্লাস করে।

এসব মুসলমান কারো বিরশ্মৈ কোন অপরাধ করেনি। ইউরোপে মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করাই তাদের অপরাধ। জার্মানী, ফ্রান্স, আমেরিকাসহ বিশ্বের সব কয়টি দেশই এসব মানবতাধৰণী যজ্ঞের নীরব সাক্ষী।

ইউরোপের খৃষ্টান জগত ইউরোপের মাটি থেকে মুসলমানদের নাম-নিশানাকে মুছে ফেলার সার্বদের তৎপরতাতেই মদন যোগাচ্ছে। জার্মানী, অঞ্চলী ও ইংরাজী প্রতিবেশী এই মুসলিম দেশটির অস্তিত্ব সহ করতে নারাজ। তাই মানবতার এই মহা দুর্দিনে তারা নীরব থেকে মানবতার দুশ্মনদেরকে তৎপরতা চালাতে উৎসাহ যোগাচ্ছে।

বসনিয়ায় মুসলমানদের আজ কোথাও যাওয়ার স্থান নেই। যে পথেই তারা অগ্রসর হোক না কেন মৃত্যুই তাদের নিয়সাধী। এ অবস্থায় নিজেকে একবায় এসব মুসল-মানদের স্থানে ভেবে দেখুন। চিন্তা করে দেখুন এই ক্যাম্পে পাশবিকতার শিকার মহিলাটি যদি আপনার স্ত্রী বা কন্যা হতো তবে আপনার অবস্থা কেমন হত। তার কর্ম অবস্থা আপনি একবার ভেবে দেখবেন কি? প্রতিদিন সার্বদের ক্যাম্পে আপনার স্ত্রী-বোনের ন্যায় হাজার হাজার মুসলিম মহিলা ধর্ষিত হচ্ছে। এদের ভবিষ্যত নিয়ে আপনাদের কি কোন মাথা ব্যথা নেই? আপনারা কি দূরে থেকে শুনতে পান না মজলুম বসনিয়ার মুসলমানদের বুকফাটা আর্তনাদ? আপনারা কি ভুলে গেলেন এই নির্যাতিত মুসলমানরা আর কিছু না হোক অস্ত নির্যাতিত, নিপীড়িত, অসহায় একদল মানুষ, তারাও মানব সন্তান? আমরা আর কত কাল এই অপমানের জ্বালা সহ্য করব, কতকাল শক্র বুলেটের নির্যাতনের শিকার হব? আপনারা যদি আমাদের রক্ষা করতে না পারেন, যদি না পারেন অযিকুণে নিষেপ করা মুসলিম শিশুদের রক্ষা করতে তবে বলে দিন আমরা কি করব? আমাদের জন্য

গাড়ী ও বিমান বোঝাই ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়ে উপহাস না করে আমাদের জন্য গর্ভনিরোধক ঔষধ পাঠিয়ে দিন, যাতে আমাদের আর সার্ব শিশু জন্য দিতে না হয়।

আমরা আপনাদের কাছে রূপ্তি, কাপড় চাই না। আমরা ইঞ্জিতের নিরাপত্তা চাই। ইঞ্জিতকে নিরাপদ রেখে মৃত্যুবরণ করতেও আমরা রাজী। আমরা স্বদেশ, স্বাধীনতা রক্ষা করতে ইসলামের পথে শহীদ হতে প্রস্তুত। আমাদের বীর সন্তানেরা সেই লক্ষ্যে খালি হাতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত। তাদের আত্মরক্ষা, দেশ রক্ষা ও মানবাধিকার রক্ষার জন্য, নির্যাতিত হাজার হাজার মুসলিম নারীকে উদ্ধার করতে অস্ত সংগ্রহ করার সুযোগ দেয়া হোক। কাফির, নাছারারা জাতিসংঘকে ব্যবহার করে যে অমানবিক অস্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছে তার অবসান ঘটানো হোক।

আমরা শাখ লাখ মজলুম মুসলমানদের পক্ষ থেকে আমাদের দ্বিনি ভাইদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, আমাদের দুর্দশার অবসানে আপনারা বাস্তব পদক্ষেপ নিন। ইহুদী, নাছারাদের ওপর আমাদের সমস্যা সমাধানের বোঝা চাপিয়ে দেবেন না। ইহুদী নাছারারা কখনো মুসলমানদের সাহায্যকারী হতে পারে না। আপনারা আপনাদের ইমানী দায়িত্ব পালন করুন। মুসলমান মাত্রই একে অপরের ভাই এবং একজনের বিপদে অন্যজন এগিয়ে যাবে, তাকে সাহায্য করবে। আপনাদের কাছে এই ইমানী দায়িত্বকুই আশা করিব।

জানি না কারার সৌহ প্রাচীর ভেদ করে আমাদের এই আবেদন আপনাদের নিকট পৌছবে কি না। আমরা জানি না আমাদের এই ট্রাঙ্গেডি ও দুর্ভোগের ব্যাপারে আপনারা অবগত কি না। যদি আমাদের সৌভাগ্য হয় এই চিঠি আপনাদের কারো হাতে পৌছায় তবে আমাদের আবেদন বাংলাদেশের মুসলিমসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের কাছে পৌছে দিন। তাদের জানান, বসনিয়ার লক্ষ সোক অনাহারে বন্দী শিবিয়ে দিনের

পর দিন নির্যাতন ভোগ করছে। হাজার হাজার নারী সার্ব শিশু গর্ভে ধারণ করে ধর্ষণ ক্যাম্পে দিন কাটাচ্ছে। তারা আপনাদের সাহায্য চায়। তাদের দুর্দশা মোচনে আপনারা দৃঢ় পদক্ষেপ নিবেন এ আশায় এখনও বেঁচে আছে। বায়ানটি মুসলিম দেশের সোয়াশ কোটি মুসলমানদের সবাই মানবসন্তা হারিয়ে ফেলেছে, এ কথা আমরা বিশ্বাস করতে চাই না।

ইতি

আপনাদের দ্বিনি মা-বোন"

আমরা জানি না চিঠির প্রতিটি ছত্রে-ছত্রে মানবাধিকার লংঘনের যে মর্মস্পর্শী ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে বিশ্বের ইতিহাসে তার কোন নজির খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা। অংশ এই ঘটনা ঘটছে মানবতার নেকাব পরিহিত খোদ ইউরোপের প্রাণকেন্দ্রে। আমরা জানি না, আমাদের দৃষ্টিতে এই মানবাধিকার লংঘন ঘটনা ইউরোপীয় কালচারের একটা অংশ কি না, সাদা চামড়ার মানুষদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কি না। যদিতা না-ই বা হবে তবে মহাশক্তিধর ন্যাটো, যুক্তরাষ্ট্র যারা মৃত্যুর মধ্যে দুনিয়া ওলট-পালট করে ফেলার ক্ষমতা জাহির করে তারা এ ব্যাপারে গত ১৩ মাস যাবৎ হস্তক্ষেপ করল না, সার্বদের বর্বরতা বন্ধ করতে আগ্রহ দেখাল না! সার্বদের তথাকথিত গণভোটের পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিতি মোতাবেক বিশ্ব আশা করেছিল, এবার যুক্তরাষ্ট্র সামরিক হস্তক্ষেপ করবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিম বিশ্ব সে আশার গুড়েবালি দিয়ে সমস্যা দীর্ঘায়িত করল কোন উদ্দেশ্যে? গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া, ফ্রান্স, বৃটেন, জার্মানী ও স্পেন মিলে নয়া যে অন্তু প্রস্তাবে ঐকমত্য হয়ে তা বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে প্রস্তাবে বলা হয়েছে, নিরাপদ এলাকা পাহারায় আরও শান্তিরক্ষী মোতায়েন করা হবে, সার্বিয়ার সীমান্তে অস্ত গোলাবারুন্দ আমদানী

(১৩পৃঃ দেখুন)

# নারী স্বাধীনতা ও আমাদের সমাজ

প্রিমিপাল এ. এফ. সাইয়েদ আহমাদ খালেদ

আল্লাহর সাধের সৃষ্টি মানুষ; এরা আবার দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত: নারী ও পুরুষ। এ দুয়োর কর্মের উপর সমাজ, দেশ ও জাতি তথা মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ভরশীল। যথেচ্ছাচার মানব কল্যাণের অস্তরায়; সামাজিক অবক্ষয় ডেকে আনে— রাষ্ট্রীয় উন্নতি ব্যহত হয়। এক কথায়, যথেচ্ছাচার, উচ্চ ঝুলতা ও সকল রকম অশোভন আচরণ সীমাহীন দুর্গতির ইঙ্গিত বহন করে এবং এই জাতীয় কার্যকলাপকে আদৌ ‘স্বাধীনতা’ বা ‘প্রগতি’ আখ্য দেওয়া যায় না।

আজকের মুসলিম নারীদের স্বাধীনতা (?) পাঞ্চাত্যের বেহায়াপনার নগ্ন প্রকাশ বৈ আর কিছু নয়। আমরা মুসলিম, পৃথক সত্ত্বার অধিকারী একটি জাতি। আমাদের আদর্শ পৃথিবীর অন্য জাতির ন্যায় মনগড়া আদর্শ নয়। আল কুরআন ও আল হাদীস কর্তৃক দেওয়া নীতিমালাই আমাদের আদর্শ—চোর পথের পাথেয়; পরিভাপের বিষয়, আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ—নিবেধ উপেক্ষা করে আজ আমরা কোন পথে? এককালের আলোড়ন সৃষ্টিকারী মুসলিম জাতি আজ দিশেহারা— আধারের অভিযান্তা। সীয় আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে ঘরে ও বাইরে মুসলমানদের আজ চরম দুর্গতি।

ইতিহাস পর্যালোচনায় এই—ই অবগত হওয়া যায় যে, মানুষ যখন আল্লাহকে ভুলে অধঃপতনের দিকে ধাবিত হয়েছে, তখনই তাদের শেষ পরিণতির হাত থেকে রক্ষার নিমিত্ত আল্লাহর তরফ থেকে নবী বা রাসূল প্রতিনিধি হিসাবে সেই জাতির মধ্যে প্রেরিত হয়েছেন। এমনই একটি চরম অধঃপতিত জাতি ছিল মুসলিম পরিবেশে লালিত আরবগণ, যারা ছিল চির স্বাধীন ও চির দুর্বত্ত। খোদায়ী

বিধান ও কেতাবী জ্ঞান বিবর্জিত সে ও নির্ভজ এই আরব জাতির মধ্যে পুরুষের প্রাধান্য ছিল অসীম। নিয়ন্ত্রণ বিহীন খোলা মেলা মরচাচারী নারীগণ ছিল পুরুষের উচ্চল আনন্দ উপভোগের প্রধান বস্তু—বিশেষ। তারা ছিলো হৃদয়হীন নিষ্ঠুর আচরণের সামগ্রিক শিকার। তৎকালীন সমাজের তথাকথিত স্বাধীনা এই বিশেষ শ্রেণীর নারীদের মর্ম বিচারী কোন পুরুষের প্রাণে সামান্যতম করণ্গার উদ্বেক করত না। নারী ও পুরুষ উভয়ই তো সেদিন স্বাধীন ছিল, ছিল মুক্ত। পুরুষের অত্যাচারী নেতৃত্ব বা পাশবিক শক্তিকে কেন প্রতিহত করতে পারত না বাধা—বন্ধনহীন সে যুগের উচ্চ ঝুলায় অভ্যন্ত স্বাধীনা নারীগণ? কেন আদায় করে নিতে পারেনি পুরুষের কাছ থেকে তাদের ন্যায় দাবী? অসংয় কারণের উল্লেখ করার দরকার নেই। এতটুকু বলা যায়, নারী কোমলপ্রাণ—দুর্বলতার অবকাঠামো দিয়ে তার দেহের গঠন এবং মাতৃত্ব সূলত করণার ফলগুধারা তার মাঝে প্রবাহমন। পক্ষান্তরে পুরুষ সাহসী, শক্তিশালী, দুর্দমনীয় ও প্রথর সূর্যের তীরুতাসম তাপ তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট। একে দমন ও পরাজিত করার ক্ষমতা নারী চরিত্রে সংযোজন করা হয়নি। জ্ঞান মার্গের সমকক্ষতা দাবী করলেও পুরুষের রূপ্ত জনিত কর্মকাণ্ডের সাথে তাল মিলিয়ে চোরার শক্তি নারীকে দেওয়া হয়নি। তাই নারীর বুদ্ধিমত্তার প্রথরতা রক্ষা পায় পর্দা—পরিবেষ্টিত পরিবেশে, পর্দার অতরালে। সকল নিরাপত্তা ও মর্যাদা তার পর্দায়। নারীর পবিত্র ইজ্জত, সন্ত্রম ইত্যাদি অবশ্যই ঢেকে রাখার বিষয়; এর নগ্ন বহিঃপ্রকাশ অনন্তকাল পুরুষের যৌবিক লালসার খোরাক যুগিয়েছে। নারীর

নগ্নতা, বেহায়াপনা তথাকথিত হাতে হাত ধরে চোর স্বাধীনতা তাদের সম্মানবৃদ্ধি ও সন্ত্রম রক্ষায় মোটেই সাহায্য করেনি। আজকের নারী সমাজ যদি সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষতা দাবী করে পাশা—পাশি তাল মিলিয়ে চলতে চায়, তবে পনের শত বছর পূর্বের নারীরাও তাদের সর্ব প্রকার অধিকার ভোগ করত; সমাজ ছিল খোলা মেলা। মুক্ত সমাজ তো তাদের স্বাধীনতা দিয়েছিল! তথাপি কেন তারা পুরুষ কর্তৃক চরমভাবে নির্যাতিত ও লাঙ্গিত হত? অবাধ স্বাধীনতা ভোগকারী নারী সমাজ সংঘবন্ধভাবে কেন প্রতিহত করতে পারত না পুরুষের বিষাক্ত কামুক ছোবল? এপ্রসঙ্গে অনেক কথা, প্রশ্নের পর প্রশ্ন। সেদিকে অগ্রসর না হয়ে বলা যায়, সেই অজ্ঞতাপূর্ণ নগ্নতার যুগে যে দুএকটি গোত্রের নারী তাদের মান—সমান, ইজ্জত—সন্ত্রম, রূপ—লাবণ্য—ইত্যাদিকে যথাসম্ভব যুগপোয়োগী ঘূণিত ভাবধারার চালিত সামাজিক পরিবেশ হতে রক্ষা করার চেষ্টা করতো, তারা অপেক্ষাকৃত বর্ধনীয় অত্যাচার ও নিগৃহিত হতে মুক্ত ছিল—ইতিহাস সাক্ষী। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীর ললনাগণই ছিল স্বাধীন।

মুক্তির দিশারী ধরনীর প্রেষ্ঠতম মহামানব হ্যরত মুহাম্মদ (সা) এলেন আগোর মশাল হাতে করে। ইসলামী প্রদীপ শিখায় সব অঙ্গকার, বিভিন্নিকাময় যত হাহাকার, সর্ব প্রকারের জুলুম বিদূরিত হলো। মায়ের জাতি, বোনের জাতি, মেয়ের জাতি পেল পরম স্বাধীনতা পর্দার অস্তরালে অবস্থান গ্রহণ করে। শালীনতা বিমুখ জীবনের নোংরায়ি থেকে রক্ষা করে দুঃসহ স্বাধীনতা ভোগকারী নারীকে দিলেন প্রকৃত স্বাধীকার।

পর্দাবৃত অবস্থায় তাদের সকল প্রয়োজনীয় কর্মের অধিকার। শান্ত হলো সকল অত্যাচারের ধ্বনি; পুরুষদের আইনের গভী রেখায় আবদ্ধ করলেন। তাদের বিষাক্ত হোবল হতে নারী রক্ষা পেল। যথেচ্ছাচারের অবসান ঘটল। নারী শৃঙ্খলিত হলো না, হলো না বল্লী। ইসলাম পূর্ব যুগের একমাত্র ভোগের বস্তু নারী ইসলামী তথা নবী জীবনের পরিশে হলো পৃথিবী-অন্তরায় মুক্ত জাতীয় জীবনের কল্যাণধর্মী একটি বিশেষ শ্রেণী।

পরিতাপের বিষয়, আজ সেই নারীরা রাসূলের উপদেশ বিশৃঙ্খলাত যুগের কল্পকময় অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তিতে মেতে উঠেছে। নানা নম বিষয়ে তারা অগ্রসর। শুনতে চাই, বলাইন নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার যুগে কি ছিল নারীর স্বাধীনতা না ইসলামী যুগের 'পর্দা' এনে দিল এই নারী স্বাধীনতা? নারী জীবনের স্বাধীনতা কে দিঃ ইসলামী শাসন না অঙ্গ যুগের পৈশাচিক বর্বরীয় পরিবেশ? পর্দার সমালোচনা কেন? মুসলিম নারীরা পর্দার মাঝে দিয়েই জগতের বুকে বিশ্ব সৃষ্টি করেছে— এখনও করতে পারে। প্রচেষ্টা নেই, পরিচর্যা নেই তাই যত বিপর্যয়।

ইসলামী শরিয়ত বাড়াবাঢ়ি যেমন পছন্দ করে না, তেমনি অতিরিক্ত গৌড়ামীও মানতে রাজী নয়। ইসলাম যারা বুবেন না, ধর্মের ব্যাপারে যারা উদাসীন তারাই ইসলামের বিকৃত অর্থ করার প্রয়াসী। গরুর গোশত খেলেই মুসলমান বলে দাবী করা যায় না। কেননা, বৃষ্টিনরাও গরুর গোশত তক্ষন করে। পার্থক্য কোথায়? হ্যা পার্থক্য ও ব্যবধান এত যার বর্ণনার ক্ষেত্র এটা নয়। আমার কথা হলো, ঈমানদার মুসলমানরাই ইসলামের এইরূপ অপব্যাখ্যায় বিশেষ তৎপর এবং এটাই তাদের কাজ। ইদানিং এইরূপ একজন মহিলা পর্দা, মেলা-মেশা এক কথায় ইসলামী বিধি-বিধান সম্পর্কে

জঘন্য উত্তি করেছেন। ইসলামী নামে তিনি পরিচিত হলেও সঠিক পথে পরিচালিত মুসলিম জাতির কাছে তিনি কতটুকু গ্রহণীয়া, তা এই পথহারা বিকৃত অর্থকারিনী মহিলাই ভেবে দেখবেন বলে আশা করি। আল্লাহর শান্তি থেকে কি তিনি রেহাই পাবেন? পেয়েছে কেউ অতীতে? এদের কারণেই আজকের নারী সমাজ নানা রকম দুর্গতির শীকারে পতিত হচ্ছে। যা প্রতিহত করার যন্ত্র তারা আবিষ্কার করতে পারেন। পারছেন কি বিকৃত মন্তিক প্রসূত অপসমালোচকরা নারী দুর্গতি প্রতিহত করতে?

পুরুষ-প্রাধান্য চিরকালের সর্বযুগের। দশটি নগ্নভাবে পথ চলা নারী একটি পুরুষ যুবকের লোত কাতর বা লাপ্পট্য দৃষ্টি এড়িয়ে চলার শক্তি রাখে না। পর্দাহীন উলঙ্গ চলাফেরার কারণেই বথাটে যুবকদের অবৈধ কামনার শক্তি যোগায়। পক্ষান্তরে একটি পর্দাবৃত্তা নারীর চলাফেরার প্রতি স্বত্বাবতই দশটি উচ্চঙ্গল যুবক যথাযথ শন্দা প্রদর্শন করতে বাধ্য হয়। এরূপ প্রমাণ আছে। এবার বলুন, কোন নারী স্বাধীনঃ বোরকাবৃত্তা না বোরকা বিমুখ নারী? যৌবন প্রচুরিত দেহকে সংযত না করে বরং যুবকদের কুণ্ডলির সুযোগ দানের নিমিত্ত নগ্নভাবে পথে ঘাটে স্কুল-কলেজে যত্নত্ব যাতায়াতের নাম কি স্বাধীনতা? পরিণামে যদি কিছু ঘটে বা ইদানিং ঘটছে সে জন্য দায়ী কে? সমাজ না অভিভাবক? আমি মনে করি এ জন্য দায়ী অভিভাবক বা ব্যক্তি। কারণ ব্যক্তির সংস্কারের উপরই সামাজিক সংস্কার নির্ভরশীল।

সত্যের কোন প্রতিবাদ মেনে নেওয়া যায় না। হ্যারত খাদিজা-আয়েশা-ফাতেমা (রাঃ), পতিগতা প্রাণ সাধী রহিমা (রাঃ), বীরাঙ্গনা খাওলা ও বীরাঙ্গনা সখিনা, তুরস্কের চির খরণীয়া নারী খালিদা এদিব খানম, মোগলবিদুয়ী জেবুমিছা, জাহানরারা, গুলবদন, এরূপ অসংখ্য নারী জিহাদ ও

যুদ্ধের ময়দানে, ইতিহাস, কাব্য-সাহিত্য, ধর্ম-দর্শন তর্কশাস্ত্র, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি চর্চাসহ সমাজের সর্বস্তরে যে অবদান রেখে গেছেন, তা আজও বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় শৃঙ্খলির মাইল ফলক হিসাবে অর্জন হয়ে রয়েছে। তাদের দেওয়া পথ-নির্দেশনা ও জ্ঞান গবেষণার আলোকেই দুনিয়ার নারী সমাজ ধন্য। এরা কি পর্দার ভিতর দিয়েই সব কিছু সম্পন্ন করেননি? পর্দা কি তাঁদের প্রয়োজনীয় কর্মের অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল না গৌরব বৃদ্ধি করেছিল? পর্দার অন্তরালে থেকে তাঁরা জগত তথা জাতিকে যা দিতে পেরেছেন, পর্দার বিমুখ যথেচ্ছাচার এবং বেহায়াপনায় অভ্যন্ত আজকের নারী বিশেষ করে মুসলিম নারী সমাজ তা দিতে পারছেন কি? অবশ্যই না। সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থতার প্রাণি নেমে আসছে। দৃষ্টিষ্ঠান বিবেকের বিচার ও চিন্তার গভীরতা। পর্দাহীন নামের স্বাধীনতার ফলে সংসার থেকে সর্বস্তরে দুর্ভোগ নেমে আসছে। কর্তা বা পুরুষ-ব্যক্তিত্ব অবক্ষয়ের পথে ধাবমান। ইসলাম বিরুদ্ধে স্বাধীনতা দানের ফলে মেয়েদের অশালীন ব্যক্তিত্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, যা ইসলাম ধর্ম আদৌ সমর্থন করে না। এই সমাজ বিধ্বংসী প্রশ্রয় রোধ করা কি সম্ভব হবে? ব্যতিক্রম ও ভাল নারী যে নেই, শরিয়ত সম্মত অনুপ্রম চারিত্রের নারী যে সমাজে একেবারেই নেই, তা অস্বীকার করছি না। অবশ্য তারা আঙুলে গোনা। অধিকাংশ মুসলিম মেয়েদের স্কুলপাটাই তুলে ধরা আমার এ প্রবন্ধের আসল বিষয়।

বিশাল প্রথিবীর মধ্যে একটি দেশ এই বাংলাদেশ। এদেশের অধিবাসীর শতকরা নব্রই ভাগেরও অধিক মুসলিম। দুঃখ লাগে, বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিম যুবতী ও বধুদের পথে-ঘাটে হাটা-চলা এত বিশ্রি ও অশোভন যার বর্ণনা প্রদানে কলম থেমে যায়। (ব্যথাহত প্রাণেই সেখনি চালাতে হচ্ছে) এর কুণ্ডল ভোগ করেও তারা উপলব্ধি করতে পারছে না কোথায় গলদ!

যুগে যুগে খোদার গংজব নেমে এসেছে যে নারীর বেচ্ছারিতা, অবাধ্যতা, নহতা ও নির্ণজ্ঞতা এবং পুরুষের প্রশ্রয় দানের কারণে সেদিকে কারও খেয়াল নেই। পক্ষান্তরে ভালোর ও ভালো কথার অহরহ প্রতিবাদ চলছে। নারীকে লালন-পালন, ভরণ-পোষন, সাধ্যমত সবকিছু পূরণের যথাযথ দায়িত্ব কর্তা ব্যক্তি পুরুষের এবং এ যারা স্থাকার ও পালন করে চলছেন তারাই এই ক্ষণিকের দুনিয়ায় আর্থিক কঠিন থাকলেও শাস্তিতে আছেন বা থাকেন। আর এই প্রাচুর্য বিহীন শাস্তির মাঝেই তো স্বাধীনতার আবাদ। সত্যের সাদ চিরকালই তিক্ত; হজম করতে পারলে পরিণাম বড়ই মিষ্ট। দৃঢ়খের বিষয়, হাল জামানার বিভিন্ন ডিগ্রীধারী শিক্ষিত (১) পুরুষ সমাজে মেয়েদের আয় উপর্জনের উপরাই যেন নির্ভরীল হতে বেশী আগ্রহী। এমনকি মাদ্রাসায় পড়ুয়া অনেক সোকও এই প্রবণতার শিকার। ফলে মেয়েদের শরিয়ত বিহীন বেহায়া ও বেপরোয়া চলাফেরা আজ ঘরে ও বাইরে পরিসংক্ষিত হচ্ছে। এজন্য দায়ী করা? বলতে সংকোচ নেই, মেয়েদের এই ছন্দছাড়া, বল্লাহীন আবদার ও আবর বিহীন ঘোরা ফেরার জন্য সংগতভাবেই অভিভাবকরা দায়ী। একেপ প্রশ্রয় নারীর স্বাধীনতা নয় নারী জাতির ক্ষয়িক্ষুতিরই নাম।

মেয়েদের অভিভাবক পিতা, বোনের বড় ভাই, স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বামী। এদের প্রতি তাদের প্রাধান্যই বেশী ও ন্যায় সংগতভাবেই স্থীর। মেয়েরা, বধুরা মাদ্রাসা স্কুল-কলেজে পড়বে, একান্ত প্রয়োজনে ও কর্তব্যের তাগিদে বাইরে কোথাও যাবে তাতে আপন্তি বা বাধা কোথায়? আপন্তি শুধু নহতাবে পদ্মবিহীন চলাফেরায়। অবশ্যই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢেকে এক কথায় বোরকা আবৃত্তা অবস্থায় সকল দায়িত্ব পালন করবে ও করতে হবে। এটাই নারী স্বাধীনতার দৃষ্টিতে নারীর গর্ব। পরিত্র রূপ-সৌন্দর্য ধরা পড়তে পারে, এমন অবস্থায়

কোন মতেই বাইরে যেতে দেওয়া উচিত নয়। এটাই ইসলাম, এটাই পর্দা—নারী জাতির উদ্ধারকারী শাশত নবীর (সা:) সর্বকালের উপযোগী উপদেশ। এবং এইভাবে চললে ও সব কিছু করলে জীবন যেরূপ নিরাপদ থাকে, নারীর পৌরব যেমন বৃক্ষ পাবে, পরিবারিক শাস্তি ও তেমনি বজায় থাকবে—ইনশাস্ত্রাহ।

আজকাল এমন কিছু ইসলামী মূল্যবোধের ক্ষতি সাধনকারী মুসলিম দেখা যায় যারা নিজেদেরকে চলায় ও বলায় ছুরতের অনুসারী হিসাবে জাহির করে। তারা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে নবী করীম (সা:)—এর পবিত্র বাণী প্রচারে সদা ব্যাপ্ত, শরিয়তের উপদেশ দানে অহরহ তৎপর এমনকি দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরীর ব্যাপারে কত না ব্যাস্ত; কিন্তু তাদের তিতর অনুসার শূন্য। জিহাদের কথা শুনলে শিউরে উঠেন, দানের ব্যাপারে বিতর্কে অবতীর্ণ হন, পর্দার তাকিদের কথা বললে মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়, এই বুঝি স্বাধীনতা গেল এক কথায় ফরজ রক্ষায় ও পালনে উদাসীন অর্থ রূটিন মাফিক ধর্ম সভা, মিলাদ মাহফিল ইত্যাদির আজামে কোন ত্রুটি নেই। এই শ্রেণীর অবস্থা হচ্ছে: “মদ খাও আপন্তি নেই, গৌরু যেন ডিজেনা।” আফসোস বাড়ীর মহিলাগণ কোন সুরাতে পথে বের হয় সেদিকে একটুও ক্রক্ষেপ করে না। আরো মজার ব্যাপার, অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকগুলি পর্যায়ক্রমে যুবতী, বধু ও কন্যাদের নার্গী অবস্থায় সঙ্গে করে পথে-ঘাটে মাঠে হাওয়া খেতে বের হন, বাজারে চলাফেরা করেন। এ পৈশুচুক আনন্দ উপভোগের চেয়ে তিনি যে সমাজকে কশুষিত করছেন, শরিয়তের অবাধাননা করছেন সেদিকে লক্ষ্য নেই; বিবেক তাকে ক্যাঘাত করে না। পরিণামে দাম্পত্য জীবনে যদি কোন অঘটন ঘটে, অশাস্তির সৃষ্টি হয় তখন দোষ পড়ে, মেয়ে ভাল, বেটা খারাপ অথবা ছেলে ভাল, মেয়েটি খারাপ। বেহায়া

স্বাধীনতার ফলে যে এই সব ঘটছে তা একবারও অবরুণে উদ্দিত হয় না। [অসমাঙ্গ]

## বসনিয়ার চিঠি

(১০ পৃঃ পর)

বক্ষে পর্যবেক্ষক বাহিনী মোতায়েন করা হবে। সার্বদের ভারী অস্ত্রের বিরুদ্ধে বিমান শক্তি ব্যবহার করা হবে। তাতে হবে, কিন্তু প্রশ্ন হল বসনিয়ার সার্বভৌম অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কি হবে, মুসলমানদের আত্মরক্ষা করার জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং বর্ষৰ সার্বরা যে ধর্মণ ক্যাম্প ও বন্দী শিবিরে সাথ সাথ নরনারীর ওপর নিপীড়ন চালাছে তা কে বন্ধ করবে? নাকি মুসলিম নারীদের ধর্মণ ঘটনা মানবাধিকার সংঘনের সংজ্ঞায় পড়ে না, মুসলিম নারীদের ইঞ্জের কোন মূল্যই নেই যে সে ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন বোধ হয়নি। এছাড়া প্রস্তাবে ভারী অস্ত্রের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সার্বদের হাতে যে হাজার হাজার অত্যাধুনিক মেশিনগান, সাব মেশিনগান, বন্দুক, রকেট সাধার রয়েছে যা হালকা অস্ত্র বলে প্রস্তাবের বাইরে রাখা হল এগুলি কি মানবাধিকার রক্ষায় ব্যবহার করা হচ্ছে এবং হয়েছে। নাকি এগুলির মুখে দুএক কস্তা খয়রাতি সহায়ের রূটি নিক্ষেপ করলেই থেমে যাবে? আচর্য হতে হয় সাদা দুনিয়ার মানবাধিকার রক্ষার তৎপরতা দেখে।

বসনিয়ার অভ্যন্তরে যেখানে হাজার হাজার সাবীয়ান মারাত্মক অস্ত্রসজ্জিত তাদের নিরস্ত্র করা গেলেই পরিস্থিতি শাস্তি হয়ে আসে, পচিমা বিশ্ব তা না করে সার্বিয়ার সীমান্ত অবরোধে তৎপর হচ্ছে। অর্থ গত ৩ মাস আগেই জাতিসংঘের কঠোর অবরোধের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবেই এ কাজটি সম্পূর্ণ হওয়ার কথা। পুরোনো প্রস্তাব নিয়ে নতুন করে মাঠ গরম করার পাচাত্তের মেনাফেকী তৎপরতা সত্ত্বেই ধীধায় ফেলানোর ব্যাপারই বটে।

# ফারুকী ট্রাস্ট বাংলাদেশ এর কর্মসূচী ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়

দেশ ও মিল্লাতের এছলাহ ও খেদমতের মহান জ্যবায় উদ্বৃক্ত হয়ে  
আজ থেকে দু'বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ইসলামের মহান খলীফা হ্যরত  
ওমর ফারুক (রাঃ) এর পুণ্য নাম বিজড়িত এক খালেছ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান  
ফারুকী ট্রাস্ট বাংলাদেশ বর্তমানে তার সকল বিভাগে পূর্ণ উদ্যোগে  
তৎপরতা শুরু করার পদক্ষেপ নিয়েছে। জন্ম লগ্ন থেকে এই প্রতিষ্ঠান  
বিভিন্ন সমাজ—কল্যাণমূলক কাজের পাশাপাশি লিফলেট প্রকাশ, আদর্শ  
মত্ত্ব কায়েম ও বিভিন্ন মাদ্রাসা সমূহে অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে আসছে।  
এখন নদওয়াতুল উলামা লখনৌ ও স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে  
প্রতিষ্ঠিত এদারাতুল মাআরিফের ন্যায় একটি উচ্চাপের গবেষণা একাডেমী  
ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার জন্য জোরদার মেহনত করছে। এ প্রতিষ্ঠানের  
সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সকলের আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা  
একান্তভাবে কাম্য।

মহাসচীব

## ফারুকী ট্রাস্ট বাংলাদেশ

৭৮/১ ঢালকানগর লেন,

গোপারিয়া, ঢাকা।

# জীবন্ত কন্যা সমাধিষ্ঠ করার পৈশাচিক রীতি ও আজকের ভারত

## নাসীম আরাফাত

প্রাক-ইসলামী যুগের আরব ইতিহাসের পাতা উচ্চালে শরীর শিউরে উঠে। তাই তাকে আমরা অঙ্গকার যুগ, জাহিলিয়াতের যুগ বলে থাকি। কথায় কথায় যুদ্ধ, রক্তারঙ্গি, হানাহানি ছিলো তখনকার দিনে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তাহাড়া তখনকার ইতিহাসে জীবন্ত কন্যা সন্তান সমাহিত করার যে পৈশাচিক দৃশ্য ফুটে উঠে তা পাঠ করে পাশাং হৃদয় লোকের অঞ্চল সংবরণ করা ও দারণ কষ্টকর হয়ে দাঢ়ায়। নিষ্পাপ কঢ়ি কঠের ফরিয়াদ পাশাং পিতৃহৃদয়ে একটুও দয়ার সংঘার করতো না। স্বহস্তে সমাধিষ্ঠ করে প্রসন্ন হৃদয়ে ফিরে আসতো তারা।

তখনকার দিনে নারী ছিলো সমাজের সাধ্বনার প্রতীক। কাল পরিক্রমায় এ কন্যা শিশুই যুবতী হয়ে অজ্ঞাত যুবকের স্ত্রী হবে আর সে হবে তার শঙ্গুর। এ ধরণের চিন্তাই তাদের ধাতে সইতো না। তাই জন্মক্ষণেই কলংকের এই চিহ্নকে মুছে ফেলার জন্য এই নবজাতককে জীবন্ত সমাহিত করতে তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হত না।

স্বার্ব নাহলে আল্লাহ রায়ুল আলামীন তাদের এ বর্বরতার চির নিখুতভাবে তুলে ধরে বলেছেন, “আর তাদের কাউকে কন্যা সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেয়া হলে তার মুখমণ্ডল মরীন হয়ে যায়, সে চিন্তা করে, সাধ্বনা সত্ত্বেও কি তাকে জীবন্ত রেখে দিবে না মাটিতে পুতে ফেলবে। সাবধান, তাদের সিদ্ধান্ত কতই না নিকৃষ্ট।”

আরবের কয়েকটি কাবীলা এবং কিছু লোক এ নির্মম পৈশাচিক কাজে ছিলো খুব প্রসিদ্ধ। এ নর-পশুদের নিকট নবজাত নিষ্পাপ সন্তানকে জীবন্ত সমাধিষ্ঠ করা মর্যাদার বিষয় ছিলো। এ নিয়ে তারা গৌরব

বোধ করতো। একবার জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূল (সাঃ)-এর নিকট তার জীবন বাহিনী বলতে বলতে এ কথাও গর্বভরে বলে ফেললো যে, সে নিজ হাত তার আটচি কন্যা সন্তানকে জীবন্ত সমাধিষ্ঠ করেছে।

### শিশু হত্যার এক নির্মম কাহিনী

বনু তাসীম গোত্রের লোকেরা এ নির্মম অপরাধে ছিলো পারদশী। এ গোত্রে সরদার কাইস ইবনে আহিম ইসলাম গ্রহণের পর বহস্তে কন্যা শিশুর জীবন্ত সমাধিষ্ঠ করার এক করণ কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! একবার আমি সফরে গিয়েছিলাম। আমার অনুপস্থিতে আমার একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। অবশ্য আমি বাড়িতে থাকলে তার কান্নার আওয়াজ শুনার সাথে সাথেই গর্তে পুতে তার আওয়াজ চিরদিনের জন্য শুরু করে দিতাম। স্ত্রী তাকে মাতৃমতা দিয়ে লালিত পালিত করতে লাগলো। কিন্তু কয়েক দিনেই তার মাতৃ মতা এতো তীব্র হলো যে আমার নির্মতার ভয়ে তার খালার কাছে তাকে পাঠিয়ে দিলো এই উদ্দেশ্যে যে, হয়ত খালার স্নেহে লালিত পালিত হয়ে একটু বড় হলে পিতার হৃদয়েও স্নেহ দয়ার উদ্বেক হবে এবং নিষ্পাপ শিশু সন্তানটি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে।

সফর শেষে ফিরে এসে শুনলাম, আমার একটি মৃত সন্তান জন্মেছিলো। এসময় আমি আমার কাজে খুব ব্যস্ত। এদিকে আমার কন্যাটি তার খালার স্নেহে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। একদিন বিশেষ কারণে বাইরে কোথাও গিয়েছিলাম। আমার স্ত্রী এই সুযোগে মেয়েটিকে বাড়িতে নিয়ে আসে। অপ্রত্যাশিতভাবে বাড়িতে চুকেই দেখি, একটি ফুটফুটে সুদর্শনা চঞ্চলা শিশু কন্যা

ঘরময় ছুটাছুটি করছে। স্বর্গীয় এক মায়ার পরশে আমার হৃদয় মন ভরে উঠলো। আনন্দে চোখ দৃঢ়ি চিকচিক করে উঠলো। সচিকিতা স্ত্রী তা সাথে সাথেই আঁচ করে ফেললো। বুবালো যে, পাষাণ হৃদয়ে পিতৃপ্লেহের বাণ ডেকেছে। আমি সুপ্রসন্ন কর্তৃ জিজ্ঞেস করলাম। এ কে? কার মেয়ে, তারী চমৎকার তো। মায়ায় মনটি আমার জয় করে ফেলেছে।

স্ত্রী তখন সব কিছু খুলে বললো। অবলী-লাক্রমে স্নেহভরে আমি তাকে কোলে তুলে নিলাম। চুমু খেলাম। স্ত্রী কন্যাটিকে বললো, মা এয়ে তোমার আবু। অমনি সে আমাকে আবু আবু বলে জড়িয়ে ধরলো। সে যে কি সুখ, কি স্বর্গীয় আনন্দ তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আমি তাকে কাছে ডাকলে আবু আবু বলে কোলে ঝাপিয়ে পড়তো আর আমি তাকে বুকে চেপে ধরে স্বর্গীয় আনন্দ উপশক্তি করতাম।

সময়ের তালে তালে সে স্নেহ মমতার উষ্ণ পরশে প্রতিপালিত হতে লাগলো। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার বুকের মধ্যে এক হিংস্র পশ্চত্ত এসে উপস্থিত হতো। চুবে যেতাম কুচিষ্টার অধৈ পাথারে। হায় এ মেয়ের জন্য কি আমার মান মর্যাদা সম্মান সব ধূলিস্যাত হয়ে যাবে? এইতো কিছু কাল পরই সে হবে অজ্ঞাত এক যুবকের অংকসায়িনী। ঘৃণায় আমার সারা শরীর রি রি করে উঠতো। লোক সমাজে আমি মুখ দেখাবো কি ভাবে। ভুবশেষে আমার মিথ্যা আত্মর্যদা বোধ, আমার হিংস্র আত্ম অহমিকা আমাকে অঙ্গ করে ফেললো। ধৈর্যের সবগুলো বাঁধ ধ্বনে পড়লো। সিদ্ধান্ত নিলাম, আজই এ সাধ্বনা অপমানের প্রতীককে সমাধিষ্ঠ করে আত্মপ্রশান্তি লাভ করবো। সাধ্বনার দরজা

আজই বন্ধ করব।

কপট মুখে স্তীকে বললাম, মেয়েটিকে আজ সাজিয়ে দাও, ওকে এক নিম্নলিখিত সাথে নিয়ে যাবো। স্তী তাকে সুন্দর ভাবে ঝলকাপে কাপড়ে সাজিয়ে দিলো। আবার সাথে নিম্নলিখিত সংবাদে সেও আনন্দে আত্মহারা। আমি তাকে নিয়ে এক পাথুরে অঞ্চলের দিকে রওয়ানা হলাম। মেয়েটি তখন আনন্দের আতিশয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে কথনো আমার সামনে, কথনো আমার পিছনে, কথনো হাত ধরে চলছিলো। 'কিন্তু সে তো জানতো না, আমার মাঝে তখন পশ্চাত্তের কি পৈশাচিক বড় বইছিলো। আমি তখন ছিলাম অঙ্গ-মুক-বধির। তার হর্ষ উল্লাস, কল কঠের আবু আবু ডাক কিছুই আমাকে প্রভাবিত করছিলো না। দূরে এক জায়গায় গিয়ে থামলাম এবং দ্রুত একটি গর্ত করতে লাগলাম। আমার কাণ দেখে মেয়ে বিশিত হয়ে বললো, আবু! এ পাথুরে জায়গায় গর্ত করছেন কেন? নিম্নলিখিত যাবেন না? বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে যে। আমি তখন নির্বাক, নিষ্ঠু। গর্ত খনন ময়। ছিটে ফোটা ধূলিকনা আমার শরীরে লাগলে অবুরু কন্যা তা বেড়ে দিছিলো এবং বলছিলো, আবু আপনার শরীরে যে ময়লা লাগছে। গভীর গর্ত খনন শেষে আমি সেই সদাহাস্য মমতাময়ী কন্যাটি শুণ্যে তুলে গর্তে নিক্ষেপ করলাম। তার পর দ্রুত মাটি ফেলে গর্তটি ভরতে লাগলাম। অসহায় অঙ্গ সজল চোখে কেঁদে কেঁদে সে শুধু বলছিল, আবু আবু এ কি করছেন? আবু আমি তো কোন দোষ করিনি, তবে কেন আমাকে গর্তে চাপা দিচ্ছেন?

আজো তার অসহায় আর্তধনি আমাকে ব্যাকুল করে তোলে। আমি বেন উচ্চাদ হয়ে যাই। কিন্তু তখন আমি এতো নিষ্ঠুর এতো নির্মম ছিলাম যে, আমার পাষাণ হৃদয় গলে একটুও দয়ার উদ্রেক হয়নি। বরং তাকে জীবন্ত সমাধিষ্ঠ করে পৈশাচিক উল্লাস আর প্রশাস্তি নিয়ে ফিরে এসেছি।

এ নির্মম কাহিনী শুনে রাসূলের (সাঃ) চক্ষুব্য থেকে টপ টপ করে অঝোর ধারায় অঙ্গ বাড়ছিলো। গুমড়ে কেঁদে উঠছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)। আর বলছিলেন, যারা অন্যের প্রতি দয়াবান নয় আল্লাহ কিভাবে তাদের প্রতি দয়াশীল হবেন?"

আরেকটি মর্মস্তুদ কাহিনী

জনৈক ব্যক্তি জাহেলী যুগের আত্মকাহিনী এমন মর্মস্পর্শও বেদনাদায়ক ভাষায় বর্ণনা করেছে যে, রাসূল (সাঃ) তা শুনে অস্ত্র হয়ে পড়েন। সে বলছিলো, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তখন ছিলাম অঙ্গ, কিছুই জানতাম না। হাতে গড়া পাথুরে মুর্তির পূজা করতাম। শিশু কন্যাদের জীবন্ত সমাধিষ্ঠ করতাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার একটি আদরের কন্যা ছিলো। কাছে ডাকলে ছুটে এসে কোলে ঝাপিয়ে পড়তো। একদিন আমি তাকে কাছে ডাকলাম, সে আনন্দে আমার নিকট ছুটে এলো। তাকে সাথে নিয়ে আমি চলতে লাগলাম। আমি আগে যাছিলাম আর সে পিছু পিছু উৎফুল্প চিন্তে আসছিলো। বাড়ির অন্তিদূরে ছিলো একটি গভীর কৃপ, কৃপের নিকট গিয়ে আমি থেমে দাঢ়িলাম। সেও এসে আমার পাশে দাঁড়ালো। আমি তখন তার দুহাত ধরে শূন্যে তুলে কৃপে নিক্ষেপ করলাম। নিষ্পাপ শিশুটি তখন কৃপের অঙ্গকার থেকে শুধু আর্তিকার করছিলো। বড় করুণ, বড় হৃদয়বিদারক ছিলো তার কঠুন্দ। সে শুধু আবু-আবু বলে ডাকছিলো আর এই ছিলো তার জীবনের শেষ শব্দ।"

রাসূল (সাঃ) তার এই মর্মস্পর্শী হৃদয় বিদারক কাহিনী শুনে কারায় ভেঁগে পড়েন। দু'চোখ ছেপে অঙ্গধারা ঘরতে লাগলো। এক সাহাবী রাসূলের কান্নার দৃশ্যে অসহ্য হয়ে তিঙ্গ কঠে বললেন, "নিষ্প্রয়োজন ও বেদনাদায়ক কাহিনী শুনিয়ে তোমরা কেন শুধু শুধু রাসূল (সাঃ)কে কষ্ট দাও?" রাসূল (সাঃ) এ কথা শুনে বললেন, "হ্যাঁ ভাই, আবার তোমার আত্ম কাহিনীটি শুনাও।" রাসূল তখন আত্মহারা আকুল। কাঁদতে

কাঁদতে তার শুষ্ঠ মোবারক সিঙ্গ হয়ে গেল।

কত শত হাজার নিষ্পাপ শিশু যে এ জুনুম নির্বাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে তার কোন ইয়ন্তা, কোন ইতিহাস নেই। যদিও সে অঙ্গকার—নিকষ অঙ্গকার যুগেও কিছু হৃদয়বান ব্যক্তি ছিলেন। যারা এ বর্বরতা, নির্মর্মতা ও নিষ্ঠুরতা থেকে কন্যা শিশুদের রক্ষায় আপ্তাণ চেষ্টা চালিয়েছেন, কিন্তু একক ও ব্যক্তি চেষ্টা আর কতটুকু ফলপ্রসূ হতে পারে?

জীবন্ত শিশু সমাধিষ্ঠ করার প্রতিরোধে এক প্রসংশনীয় উদ্দোগঃ

কবি ফরাজদুক আরব কবি সমাজে এক উজ্জল নাম। তিনি তার দাদা সা-সার এক কৃতিদ্বৰে জন্য দারুন গৰ্বীত ছিলেন। তাঁর দাদা জীবন্ত শিশু সমাধিষ্ঠ করার প্রতিরোধে এক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সা-সা বলেন, একবার আমি আমার দু'টি হারানো উটের তালাশে ঘূরছিলাম। দূরে একটি ক্ষীণ আলোর রশ্মি দেখতে পেলাম। উৎসুক মনে দ্রুত উট চালিয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। মনে করেছিলাম, হয়ত কেউ বিপদে পড়েছে, দেখি সামান্য কোন সহায়তা করা যায় কিনা। গিয়ে দেখি, বাকড়া চুলের এক বৃন্দ গৃহের সামনে বসে আছে বিমূর্ব হয়ে। আর গৃহভ্যাসের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে মহিলা মহিলা প্রসব বেদনায় অস্ত্র এক মহিলাকে ঘিরে আছে। কৃশল বিনিময়ের পর জানতে পারলাম, তিনি দিন যাবৎ মহিলাটি প্রসব বেদনায় কাতর। ইত্যবসেরে খবর এলো সস্তান হয়েছে। বৃন্দ তখন অস্ত্র, চিত্কার করে উঠলো, যদি পুত্র হয় তবে জেহাই অন্যথায় আওয়াজ শুনার সাথে সাথেই তাকে পুত্রে ফেলবো। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললাম, মহোদয় ওকথা বলবেন না, সে তো আপনারই সস্তান। রিজিকের ব্যাপারেও আপনার চিঞ্চা নেই, কারণ আল্লাহ তো তার

জিমা খোদ নিজে নিয়েছেন। বৃক্ষ গর্জে উঠলো। না আমি তাকে পুত্র তবে শাস্তি হবো। তাকে হত্যা করে তবে আমার প্রশাস্তি। আমি এবার আরো বিগঙ্গিত বিনষ্টকঠো দ্বারণ করলে বৃক্ষ বললো, এতই যদি দরদ থাকে তবে যাও কিনে নিয়ে তাকে প্রতিপালন করো! আমি বৃক্ষের কথায় অপস্তুত হয়ে পড়ি। আকস্মাত বলে ফেললাম, হ্যাঁ দাও তাকে কিনেই নিবো। নবজাত নিষ্পাপ শিশুটিকে কিনে এক স্বর্গীয় প্রশাস্তিতে নিষিদ্ধ ঘনে ফিরে আসলাম এবং আল্লাহর সাথে ওয়াদাবদ্ধ হলাম যে, এই শিশুটিকে সেই মহত্ব দিয়ে পালন করবো এবং যখনই কোন পাষাণ হৃদয় ব্যক্তি এ ধরণের পৈশাচিক কাজে উদ্যত হবে আমি তাতে বাধা দিবো। প্রয়োজনে শিশুকে অর্থের বিনিয়ে কিনে আনবো এবং সেই মহত্ব দিয়ে শালিত পালিত করবো। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভূত হওয়া পর্যন্ত এ ধারা চলতে থাকে এবং এ দীর্ঘ দিনগুলোতে আমি ১৪ জন শিশুকে নির্দয় পিতার হাত থেকে বাঁচিয়েছি। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এসে এ প্রথা চিরতরে বন্ধ করে দেন। সমাজকে পৈশাচিকতা থেকে মুক্ত-পবিত্র করেন। তাই আল্লাহু তাঁর প্রিয় বান্দাদের পরিচয় দানে বলেন যে, “তারা সীয় সন্তানদের জন্য দোয়ার প্রাক্কালে বলবে, প্রভু হে। তাদেরকে আমাদের চোখের শীতলতা বানিয়ে দাও। আর দয়াময় আল্লাহর বান্দা তারাই যারা বলে, প্রভু। আমাদের শ্রীদের এবং আমাদের সন্তানদের আমাদের চোখের শীতলতা বানিয়ে দাও।”

#### ভারতে শিশু হত্যার নব্য পৈশাচিকতা:

সম্প্রতি এক অস্তর্জাতিক মানের পত্রিকা “গাল্ফ উকুলী” ভারতের এক মজলুম নারীর কাহিনী প্রকাশ করেছে। নিম্ন বিস্ত মজুর পরিবারের ‘রাণী’ নামক এক মহিলা হাসপাতালে একটি কল্যান সন্তান প্রসব করে। হাসপাতালে থেকে বাড়িতে এলে কল্যান সন্তানের কথা শুনে অসন্তোষ প্রকাশার্থে পুরুষেরা গৃহত্যাগ করে চলে যায়। অতঃপর রাণী নারী মহিলাটি কল্যান সন্তান জন্ম দানের অভিশাপ থেকে মুক্তির প্রয়াসে শাশুড়ির

যোগসাজশে বিষাক্ত বস্তু পানির সাথে মিশিয়ে নবজাত শিশুকে পান করানোর সাথে সাথে শিশুটি মৃত্যু বরণ করে। তারপর রাতের অঙ্ককারে পার্শ্ববর্তী এক ক্ষেত্রে গর্ত করে শিশুটিকে চাপা দিয়ে আসে। এ নির্দয় মাতাকে যখন প্রশ্ন করা হলো, এ জবগ্য পাপ কাজে কি ভূমি একটুও প্রভুকে ডয় করানি? সে নির্ধিয়া উত্তরে বললো, আমি তাকে বাঁচিয়ে রাখলেও তার ভবিষ্যৎ ছিলো অঙ্ককার। পুত্র সন্তান জন্ম না দিতে পারা আজ নারীদের জন্মস্তম অপরাধ। রাণী তাবাবেগে বলে, প্রভু পুত্র সন্তান দিলে তাল হতো, অস্ততঃ আমার জীবনটা কিছু সার্থক হতো।

বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত, ভারতে এখন হাজার হাজার অসহায় মহিলা পুরুষের জ্যোঠারে, নিপীড়নে, সামাজিক সাংঘনায় বাধ্য হয়ে এ ধরণের পৈশাচিক অপকর্ম সংগঠিত করছে। অবশ্য কুসঙ্গারাজ্যে সামাজিক ব্যবস্থা এজন্য অনেকটা দায়ী। কেননা ভারতে বিবাহ উৎসবে কেনে গ্রহণের পূর্বে রাশি রাশি ঘৌতুক এহণ করা হয়, যা একজন শ্রমজীবী নিন্মবিত্ত পিতামাতার জন্য একেবারেই অসম্ভব। তাই কল্যান সন্তান আজ ভারতে অনাকঙ্গিত ও উত্তিপ্রদ।

১৯৯২ সালে গোটা বিশে কল্যান শিশুদের অবস্থা সহলিত জাতি সংঘের এক প্রেস রিপোর্টে বলা হয় যে, অত্যাধুনিক বিজ্ঞান ব্যবস্থা নারী পুরুষের মর্যাদা বৈসম্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের বদলতে পিতা মাতারা সন্তান প্রসবের পূর্বেই ভ্রগের লিঙ্গ নির্দারণে সক্ষম হচ্ছে। ভারতে ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ৭৪ হাজার মা জন্মের পূর্বে জ্ঞনের সন্তানের লিঙ্গ অবগতির পর কল্যান সন্তান হওয়ার ভয়ে ঝুন হত্যা করেছে।

পুত্র বা কল্যান জন্ম আল্লাহর অনুপম লীলা

সন্তান পুত্র হওয়া বা কল্যান হওয়া উভয় সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছাধীন। এতে কারো ক্ষমতা, কারো কামনা বা ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার কোন ভূমিকা নেই। একমাত্র মহান রাসূল

আলমীনই জানেন, কার জন্য পুত্র সন্তান কল্যাণকর হবে আর কার জন্য কল্যান। আল কুরানের ভাষায়: “তিনিই যাকে ইচ্ছা কর্ত্তা দান করে থাকেন যাকে ইচ্ছা পুত্র দান করেন আর যাকে ইচ্ছা কর্ত্তা—পুত্র উত্তরই দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা বানিয়ে সন্তান হতে বাধিত করেন, নিঃসন্দেহে তিনি সব কিছু জানেন এবং সব কিছুতেই সক্ষম।” বিশ্ব নিয়ন্ত্রা মহান আল্লাহু রাসূল আলমীন অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সম্পর্কে অবহিত। তিনি সর্বদা বাস্তুর কল্যাণ কামনা করেন তাই আল্লাহর অপর নেয়ামত সন্তান চাই পুত্র হোক বা কল্যান হউক তাতে সর্বদা সন্তোষ থাকা উচিত এবং সর্বাবস্থায় তারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা জরুরী।

## জীবন পাথেয়

(৫ পৃঃ পর)

করলেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা মন্দা থেকে এসেছি। পথিমধ্যে কাফেরোর আমাদের প্রেক্ষতার করে। অবশেষে এই শর্তে মুক্তি দেয় যে আমরা আপনার পক্ষে যুদ্ধ করব না। এটা আপারণ অবস্থার অঙ্গীকার। আমরা অবশ্যই আপনার পক্ষে যুদ্ধ করব। রাসূল (সাঃ) বললেন, “কখনও নয়। তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে যাও। আমরা মুসলমানদের কৃত অঙ্গীকার সর্বাবস্থায় পালন করব। আমাদের কেবল আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন।” (সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবিল হায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, “নবুয়াত লাভের পূর্বে আমি রাসূল (সাঃ) এর কাছ থেকে কোন বস্তু ক্রয় করেছিলাম, কিছু মূল্য বাকী ছিল। আমি ওয়াদা করলাম যে, অবশিষ্ট মূল্য নিয়ে আমি এ শানেই উপস্থিত হব। এরপর ঘটনাক্রমে কথাটা বেমালু ভুলে গেলাম। তিনিনি পর অরণ হওয়ায় আমি সেখানে পৌছে দেখি রাসূল (সাঃ) সেখানে বিদ্যমান আছেন। তিনি বললেন, ‘তুমি আমাকে কষ্টে ফেলে দিয়েছ। তিনিনি ধরে আমি এখানে তোমার অপেক্ষায় আছি।’ (আবু দাউদ)

এ ঘটনায় রাসূলে করীম (সাঃ)-এর বিনয় ও ওয়াদা পালনের চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। (মাদারেজুনবুয়ত)

# কমাঙ্গার আমজাদ বেলাল

## আমজাদ মাঝুর

আমি বিশেষ প্রোগ্রামে শ্রীনগর থেকে  
বাসে ইসলামাবাদ যাচ্ছিলাম। সাড়ে বারোটাই  
বাস শ্রীনগর থেকে ছেড়ে। ছাড়ার সাথে  
সাথে ঘূর্মিয়ে পড়ি। পৌনে একটায় আমার  
ঘূর্ম ভাঙ্গলে দেখলাম, বাস একটি ভারতীয়  
সৈন্যদের চেক পোষ্টে দাঢ়ানো। দুই তিনজন  
সৈন্য যাত্রীদের বলছে, "নিচে নেমে এসো।"  
চোখ খুলে আমিও উঠে দাঢ়ালাম। পিছনের  
এক সৈনিককে উদ্দেশ্য করে আগের জন  
ইশারা করে বলছে, "এর উপর সন্দেহ হচ্ছে  
খেয়াল রেখো।" সে তার পরবর্তি সৈনিককে  
বল্লো "একে দুর্ভিকারী বলে মনে হয়।"  
গেটের সৈনিকটি আমাকে নিচে নিয়ে আসে।  
সেখানে আরও তিনজন সিপাহী দাঢ়ানো  
ছিল। তাদের একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করে  
"কোথা থেকে এসেছো?" বল্লাম, শ্রীনগর  
থেকে। কি কাজ করো। 'মসজিদে ইমামতী  
করি। নামজ পড়াই।' 'ইমামতী আবার কি  
জিনিস?'

আমার ভয় হতে লাগলো, কেননা সাধারণ  
ভারতীয় সৈন্যরা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই  
জানে না। সামান্য সন্দেহের বশীভূত হয়ে  
আমাকে বন্ধী করতে পারে। আমি এদের  
চেয়ে বরং অফিসারের মুখোযুথি হওয়ার  
ইচ্ছা করলাম। তারা মোটামুটি শিক্ষিত হয়  
ও তাদেরকে দলীল প্রমাণ দিয়ে বুঝানোও  
যায়। একজন সৈন্যকে বল্লাম, "তোমাদের  
অফিসার কোথায়? তার কাছে আমাকে নিয়ে  
চলো। তার কাছে সব বলবো। সৈন্যটি  
আমাকে কিছু দূরে বসা কর্ণেলের কাছে নিয়ে  
আসে।

কর্ণেল জিজ্ঞাসা করলো, "কোথা থেকে  
এসেছো?" "শ্রীনগর" "কোথায় যাবে?"  
"অন্ত নগর"। "কি কাজ করো?"  
"ইমামতী"। "ইমামতী কি জিনিস?"

"নামজ পড়াই।" "আচ্ছা আল্লাহ, আল্লাহ  
করো।"

পিছনে দাড়িয়ে এক ক্যাপ্টেন গভীর ভাবে  
আমাকে পর্যবেক্ষণ করছিল। আমার পা  
কাপছে কিনা, কঠে জড়তা আসে কিনা  
কিংবা প্রশ্ন বানে জর্জরিত হয়ে আমার  
চেহারা ফ্যাকাশে হচ্ছে কিনা তা সক্ষ্য  
করছে। আমি তার দিকে দ্রুক্ষেপ না করে  
স্বাভাবিক ভাবে জওয়াব দিয়ে যাচ্ছিলাম।

এবার কর্ণেল বল্লো, তোমার রাইফেল  
কোথায়? তোমাকে ভদ্র মানুষ বলে মনে  
হয়। অন্ত জমা দিলেই ছেড়ে দিব। আমি  
বল্লাম, "স্যার কি-যে বলেন।" আমি অন্ত  
কোথায় পাব? সে এবার ধর্মক দিয়ে বল্লো,  
আর ন্যাকামি করতে হবে না। জনদী বলো,  
তোমার অন্ত কোথায়? আমি বল্লাম স্যার  
আপনারা ভারত থেকে এসে আমাদের  
দুর্ভিকারী বলেন; অপর দিকে মুজাহিদরা  
আমাদের বলে ইভিয়ান এজেন্ট। কিছু দিন  
পূর্বে মুজাহিদরা ইভিয়ান এজেন্ট বলে  
কয়েজন আলেমকে হত্যা করে তাদের শাশ  
চৌরাস্তার মাথায় ঝুলিয়ে রেখেছিলো।  
আপনিই বলেন, এটা আমাদের দেশ এদেশ  
ছেড়ে আমরা কোথায় যাব? কর্ণেল বল্লো,  
তুমি কথায় বড় পাঁকা। কড়া প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত,  
বল, এমন ভালো ব্যক্তি আছে কি যে তোমার  
জামানত দিতে পারে? তখন আমি কয়েকজন  
বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম বল্লাম। এই রকম বিপদে  
কাজে লাগবে বলে তাদের নাম ঠিকানা  
পূর্বেই মুখ্য করে রেখেছিলো। এর মধ্যে  
এমন কিছু ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন যারা

সরকারের নিকট বিষ্ট। জিহাদের সাথে  
তাদের কোন যোগাযোগ নেই। কর্ণেল বল্লো,  
এরাও তো দুর্ভিকারীদের সহযোগী। আমি  
বল্লাম, কি-যে বলেন স্যার, এরা দীনদার

লোক। ধর্মের কাজ করেন। না এদের  
দুর্ভিকারীদের সাথে কোন যোগাযোগ  
আছে আর না আমিও কোন দুর্ভিকারী।

পয়ঃসন্ধি মিনিট পর্যন্ত এভাবে কথাবার্তা  
চলতে থাকে। বাসের সবার তল্লাশী শেষ  
হয়েছে। তারা অধীর অপেক্ষা ও আশংকায়  
আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তারা জানতো  
আমি কাশ্মীরী নই। হয়ত পাকিস্তানী অথবা  
আফগানী হব। আমার সরল কথায় কর্ণেল  
যোটামুটি আশ্রম হয়েছে। কিছু দেহ তল্লাশী  
তখনও বাকী। আমার গায়ে কাশ্মীরি  
আলখেল্লা জড়ানো। হাত দুটো আলখেল্লার  
পকেটের মধ্যে রেখে মৃদু নাড়াচি ও তার  
সাথে সাথে দৃঢ়ভাবে কর্ণেলের কথার জবাব  
দিচ্ছে। যে ক্যাপ্টেন আমার সামনে ছিল তার  
দৃষ্টি হাতের উপর পড়তেই কর্ণেলকে বল্লো,  
"স্যার নিচয়ই এর পকেটে ফ্রেনেড আছে।"  
এখন ধরা পরার সময় নিজেও মরবে এবং  
আমাদেরও মারবে। তাকে দুই কদম পিছিয়ে  
যেয়ে দাঢ়াতে বশুন।" কর্ণেল আমার দিকে  
ঘূরে দাঢ়ালো এবং জোরে কমাও দিল।  
বল্লো, দুই কদম পিছে হটে হাত উপরে  
তোলো। মনে মনে বল্লাম, এবার আর  
যেফতারী থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় নেই।  
মনে মনে আল্লাহর কাছে মদদ চাইলাম।  
আমার বিশ্বাস ছিলো যে, আল্লাহর দীনের  
হেফাজতের জন্য এসেছি, এর থেকেও বড়  
বড় বিপদে তিনি সাহায্য করেছেন। নিচয়ই  
এবারও তিনি আমার থেকে বিমুখ হবেন না।  
তিনি যেভাবেই হোক আমাকে হেফাজত  
করবেনই।

দুই কদম পিছনে সরে হাত উপরে তুলল—  
ম। হাতে একহাত তছবীহ ছিল। যা এবার  
আমার জন্য আবে-হায়াৎ হয়ে জীবন  
রক্ষকের তৃমিকা পালন করো। তছবীহ

দেখতেই কর্ণেল মোমের মত গলে যায়। সে এবার বিনয়ের সুরে বলে, ওঃ ভগবান আমাকে ক্ষমা করো, আমরা এক বেগুনাহা আদমীকে খামোখা কষ্ট দিছি। সে গর্জে উঠে বলে, “কে এই শরীফ ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে এসেছে? যাও একে বাসের মধ্যে সমস্যানে বসিয়ে দিয়ে আসো। আমার সাথে বামে হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামীর কাশ্মীরের আমীর বসা ছিলেন। আমাকে এভাবে ফিরে আসতে দেখে তার খুশীর অন্ত হিলো না। তিনি মনে মনে আল্লাহর শুভ্র আদায় করলেন।

বাস চলা শুরু করলে সকল যাত্রী আমার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে। কে এই লোক? এতক্ষণ কর্ণেলের সাথে কথাবার্তা বল্লো, কর্ণেল তাকে গালীও দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিপাহীরা এসে সমস্যানে বসিয়ে দিয়ে গেল। দেহ তল্লাশীও করলো না। নিচয়ই কোন সরকারী এজেন্ট হবে। প্রথমে বুঝতে না পেরে কর্ণেল গালী গালাজ করেছে। পরে পরিচয় পাওয়ায় হেড়ে দিয়েছে। হয়তো কোন গোপন সংযোগ আছে। বাসের সকলে আমাকে ভারতীয় গুপ্তচর মনে করে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগলো। কে আমি? কোথা থেকে এসেছি? কর্ণেলের সাথে এতক্ষণ কি কথা হয়েছে? ইত্যাদি। আমি যতটা সম্ভব তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করলাম যে, আমি কোন গুপ্তচর নই। আমাকে তারা মুজাহিদ বলে সন্দেহ করেছিলো। অনেক ওজর আপত্তি করে ঘেফতার এড়াতে সক্ষম হয়েছি। তারা কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারছিল না। এর বেশী বাসে বলাও সম্ভব নয়। কেননা এখানে কোন ভারতীয় গুপ্তচর থাকতে পারে। নামার সাথে সাথে তারা আমাকে ধরে ফেলবে। অপর দিকে আশ্বস্ত না করতে পারলে ইসলামাবাদ যাওয়াও নিরাপদ নয়। তারা কোন মুজাহিদ এঁপের কাছে ভারতীয় চর বলে আমাদেরকে ধরিয়ে দিতে পারে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলাম। দেখলাম,

প্রতিটি যাত্রীই আমার ব্যাপার নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। অগত্যা নিজের আসন ছেড়ে সামনে এসে দাঁড়ালাম। হাত দুটি দুই পকেটে ঢুকিয়ে প্রেনেড দুটি বের করে এনে তাদেরকে দেখিয়ে বল্লাম, এ দুটি ছিল আমার পকেটে। যদি কর্ণেলের সামনে আমার দেহ তল্লাশী হত তবে বাঁচার উপায় ছিল না। এবার সবার ভুল ভাঙলো। তারা নিজ নিজ মন্তব্যের জন্য অনুত্ত হয়ে ক্ষমা চাইতে লাগলো। শুধু আমার ব্যাপারেই তারা আশ্বস্ত হল না, বরং তারা ভাবতে লাগলো, যে ব্যক্তি দুটি প্রেনেড পকেটে রেখে এভাবে পয়তাপ্তিশ মিনিট কর্ণেলের সামনে জেরা করতে পারে সে কত উচ্চ স্তরের মুজাহিদ।

বাস থেকে নামার সাথে সাথে তারা আমাকে সাথে নিয়ে নিরাপদ এলাকায় পৌছে দেয়। যাই হোক, তাদের ভালোবাসা ভোলার মতন নয়। এক ঘরে নিয়ে বাসের যাত্রীরা গরম পানি দিয়ে আমার পা ধুইয়ে দেয়। আমি এক নওয়োয়ান আর আমার পিতার বয়সী হয়ে পা ধোয়াতে থাকায় লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু কোনক্রমেই এদেরকে বিরত রাখতে পারিনি।

তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনারা কবে আসতেছেন? আমি জানালাম, আমাদের কমাণ্ডার শীঘ্ৰই এসে পৌছবেন। তিনি আসলেই নিয়মিত লড়াই শুরু হবে। সকলে তাদের নাম ঠিকানা আমার ডাইরিতে লিখে দেয়। যখনই ডাক আসবে আমরা হাজির হয়ে আপনাদের কমাণ্ডে জিহাদ করবো বলে ওয়াদা করে গেল। মহরম মাসের দশ তারিখে আমি সোপুর গিয়েছিলাম। সেখানে একজন সাধী আমাকে নিকটবর্তী গ্রামের এক মুজাহিদের সাথে সাক্ষাৎ করতে অনুরোধ জানায়। সেই গ্রামে যেয়ে এক মাদ্রাসায় উঠে মাদ্রাসার ছাত্রের সাহায্যে তার খরব নিলাম। সে আমাকে তার ঘরে এসে সাক্ষাৎ করতে অনুরোধ জানায়। এই মুজাহিদ মাত্র দশ দিন পূর্বে জন্ম জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে।

ঘরের দরজায় কড়া নাড়তেই তের চৌদ্দ বছরের এক যুবতী দরজা খুলে দেয়। আমি

মুজাহিদ সাথীর কথা জিজ্ঞাসা করতেই যেয়েটি কানা শুরু করে। দরজার দুই পাশে দুই হাত রেখে আমার রাস্তা বন্ধ করে কাঁদতে থাকে। আমি বার বার তার কানার কারণ জিজ্ঞাস করে কোন উত্তর না পেয়ে ফিরে আসার জন্য রাস্তায় বের হই। এবার সে পিছন থেকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দ্ধতে আমাকে ডাক্তাতে থাকে। কাছে আসলে সে জিজ্ঞাসা করে, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? তার সাথে কেন দেখা করতে চান? তাকে বল্লাম, আমি শৈনিগর থেকে এসেছি। তার সাথে বিশেষ কথা আছে। এবার সে আমার উদ্দ ভাষা ও কথার ভঙ্গিতে আন্দাজ করে, নিচয়ই আমি কোন মুজাহিদ হব এবং আমি দূর থেকে এসেছি। ফলে সে দরজা থেকে সবে দাঢ়িয়ে একটি কামরার দিকে হাত দ্বারা ইশারা করে। এই কামরার মধ্যে সেই মহান মুজাহিদ বসে আছেন। আমাকে দেখে দাঢ়িয়ে মোছাফা করলেন। অতঃপর আমার আগমনের কারণ জানতে চান। আমি তাঁকে আমার সংগঠনের পরিচয় সহ কাশ্মীরে আগমনের কারণ ব্যাখ্যা করি। তাঁর সাথে জিহাদ ও দ্বিনে ইসলাম সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়। এর পর তাকে আমি আমাদের সংগঠনে যোগ দেওয়ার জন্য আহবান জানাই। এর জবাবে তিনি বলেন, “দেখ আমজাদ! আমার অনেক সমস্যা। আপঃতত তোমাদের সাথে যোগ দিতে পারছি না। গ্রামের যে মাদ্রাসাটি দেখেছো সেটি আমার এক বন্ধু চালাতেন। জিহাদেও তিনি শৈনীক হতেন। আমার ছাড়া পাওয়ার দুই মাস পূর্বে ভারতীয় সৈন্যরা তার দুপা কেটে দিয়েছে। জেল থেকে বের হওয়ার পর সে আমাকে মাদ্রাসা চালাবার জিয়াদারী ন্যায় করেছে। এই মাদ্রাসা থেকে এ পর্যন্ত অনেক হাফেজ ফারেগ হয়েছে। অনেকে এখনও পড়ছে। অতএব দ্বিনের স্বার্থে আমাকে এই মাদ্রাসা চালাতে হচ্ছে।

আর দ্বিতীয় কারণ যদি শোনার ধৈর্য রাখ তবে বলব। আমি আগ্রহ প্রকাশ করলে সে বলা শুরু করে এবং সাথে সাথে কানায় তেজে পড়ে। তিনি কেন কাঁদছেন আমি বুঝতে পারছিলাম না। জেল নির্যাতন, সাধীর

হস্ত পা কর্তনের খবর কিংবা ইন্টারগেশন সেন্টারে চরম নির্যাতনের মুখে দিনের পর দিন অবস্থান এসব তো কাশীরীদের কাছে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এতে একজন অকৃতভয় মুজাহিদের ঘাবড়ে খোওয়ার কথা নয়। উপরন্তু তিনি একজন আলেম এবং কাশীরে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি অবগত। তা সত্ত্বেও মদ্রাসায় চাকুরী করার অঙ্গুহাতে কিভাবে জিহাদ পরিভ্যাগ করতে পারেন। বিষয়টা আমাকে ভাবিয়ে তুলো।

তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বলতে শুরু করেন, আমজাদ ভাই! গত বছর আমাকে এক সাথীর সাথে একত্রে ফ্রেফতার করে বারামুলার এক ইন্টারগেশন সেন্টারে নিয়ে যায়। এক দিন ও এক রাত চরম নির্যাতনের পর আমাকে এক কর্ণেলের সামনে হাজীর করা হয়। কর্ণেল আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে তোমাদেরকে তো দেখতে ভালো মানুষ বলে মনে হয়।। একটা শৃঙ্খল প্রণ করলেই তোমাদেরকে হেডে দিব। আমি বহুলাম, স্যার কি সে শৃঙ্খল। কর্ণেল মৃদু হেসে বল্লো, তোমার একটি মেয়েকে এক রাতের জন্য আমার খেদমতে পাঠিয়ে দিবে। তার জানোয়ারের মত চেহারার দিকে তাকিয়ে আর ধৈর্য ধরতে পারলাম না। দেহের সমস্ত শক্তি দ্বারা সজোরে তার গালে একটা চর কষে দিলাম। জানোয়ারটা ঘুরে পড়ে গেল। উঠে বির বির করতে লাগলোঃ “দেখাছি তোমাকে মজা, বুঝবে এবার কোন ডিমরগের বাসায় ঢিল ছুঁড়ে। বলতে না বলতে সাত অটজন সিপাহী আমার ওপর বাপিয়ে পড়ে। রাইফেলের বাটের আঘাত, কিল-ঘৃষি আর বুটের সাথীতে আমার দেহ থেতলে যায়। এসময় জীপের ষাট নেওয়ার শব্দ শুনে পাই। এক ঘন্টার মধ্যে ওরা আমার বড় মেয়েকে ধরে এনে হাজীর করে। ওরা আমাকে একটি খুটির সাথে বেঁধে রাখে। এরপর চোখের সামনে যা ঘটেছে একজন পিতার পক্ষে মেয়ে সম্পর্কে তা বলা সম্ভব নয়। আমি চীৎকার করে অনুনয় বিনয় করতে থাকি। কিন্তু কিছুতেই পশুদের মনে দয়ার উদ্বেক হল না। এখানেই শেষ নয়?

এর পর ওরা আমার মেয়েকে নিয়ে আসে। তার সাথেও সেই একই আচরণ করে। এই কিয়ামত সমান অবস্থা দেখে আমার হৃদক্রিয়া বঙ্গ হওয়ার উপক্রম হয়। চোখ দিয়ে আগুন ঝলসাতে থাকে। মনে হচ্ছিলো, আমি এখনই মরে যাব। এর পর ওরা আমার দুই নাবালেগে হাফেজ মেয়েকেও হাজির করে। এবার আর হির থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। চিংকার দিয়ে উঠে বেহশ হয়ে পড়ে যাই। তখন আমার বড় মেয়েকে ওরা বেয়নেট মেরে শাহীদ করে। বাকীদের গাড়ীতে করে গ্রামে ফেরত পাঠায়। জাপেম সৈন্যরা আমার ঘর জ্বালিয়ে দেয়। আর আমাকে জ্বুর হেরা নগর জেলে পাঠিয়ে দেয়। আমার মেয়ে মেয়েটি ছিলো বিবাহিতা। সে দু'সন্তানের মা। এই ঘটনার পর সন্তান রেখে তার স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয়। এই শোকে আমার স্ত্রী পাগল হয়ে গেছে। মেয়েরা এক বছর ধরে এই পোড়া ঘরে জীবন মরণের সাথে পাঞ্জা শড়ছে। এক বছর পর্যন্ত তারা ঘর থেকে বের হয়নি। আর হবেই বা কিভাবে? বাপ বন্দি, মা পাগল, আর ইজ্জত শৃষ্টিত। বলো আমজাদ ভাই, বলো! আমরা কোথায় যাব? কি করবো?

আমাদেরকে এই দেশ থেকে কোথাও বাইরে নিয়ে যাও। এখানে থাকা আমাদের আর মানায় না। ভাই, যদি তুমি আর এক বছর পূর্বে আসতে তবে হয়তো আমাদের ইজ্জত বৌঢ়ত। আমজাদ তুমি অনেক দেরী করে ফেলেছো। আমার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমাদের চীৎকার কি দুনিয়ার মুসলমানদের কানে পৌছে নাঃ? কেন তারা আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে না? আমরা কি মুসলমান নই? এক মুসলমান বোনের ইজ্জত রাখতে মুহাম্মদ বিন কাসেম সুদূর বাগদাদ থেকে ছুটে এসে ছিলেন। তোমরা তো অনেক কাছে। এত কাছে থেকেও যদি তোমরা তোমাদের কাশীরী বোনদের করণ কান্নার ক্ষীন আওয়াজও শুনতে পাও না যিলাম নদী বেয়ে যে হাজার হাজার মা বোনের সাথে তোমাদের চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেছে,

তা দেখেও কি তোমাদের ইমান ঝুলিয়ের মত জ্বলে উঠে না?

যদি এত কিছুর পরও তোমাদের চেতনা না আসে তবে মনে রেখো, আমরা মরণে থাকবো। দীনের হেফাজতের জ্বল্য সর্ব প্রকারের কোরবানী দিয়ে যাব। তবুও এক কাশীরি জেন্দা থাকতে কাফিরের অনুগত্য স্থীকার করবো না। তাতে দুনিয়ার মুসলিম আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসুক আর না আসুক। তুমি দুনিয়ার মুসলমানদের কাছে আমাদের পয়গাম পৌছে দিও। শুধু এক ভাই নয় হাজার ভাই হাজার বোন তাদের পথ পানে চেয়ে আছে। যা করে জলন্দী আস, আর ধৈর্য বৌধ মানছে না।

তার এই হৃদয় বিদারক জীবন-কাহিনী শুনে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। অসুস্থ হয়ে বিছানার ওপর ছটফট করছিলাম। সতেরো দিন পর সেই মুজাহিদের এক মেয়ে একখনা কাগজে আমার নিকট লিখে পাঠায়, আমজাদ! এক ভাইয়ের কাহিনী শুনেই নিজিবের মত বিছানায় পড়ে গেলো। এখানের হাজারো ভাই বোনের জিন্দেগী ধূঃস হয়ে যাচ্ছে। শুয়ে থাকার সময় নেই। উঠ তোমাকে শত শত বোনের ইজ্জতের হেফাজত করতে হবে।” এই চিঠি পড়ে আমার শরীরের জ্বর-তাপ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তখনই মেয়ের পিতাকে সঙ্গে নিয়ে জিহাদের জন্য শ্রীনগর চলে আসলাম।

পাঠকদের কাছে আমার নিবেদন, কারো ইজ্জত হানির কাহিনী বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং আপনাদের ভাবতে বশিছ, যদি এই রূপ অবস্থার শিকার আপনারা হন তখন কি করবেন? সে সময় কি করণীয় হবে আপনাদের? একটু ভেবে দেখুন। আজ কাশীরী ভাই বোনদের বেলায় যা ঘটছে আমাদের সাথে তেমন হবে না এর কি কোন নিচয়তা আছে? তার প্রতিকারের জন্য আমরা কি প্রস্তুতি নিছি? আঘাত আমাদের সহায় হোন নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঢ়াবার ভৌকিক দান বরুন। [চলবে]

অনুবাদঃ মনজুর হাসান

## বাঙালী সংস্কৃতির নামে গোপনিয়াত্বে উঠান

মোহাম্মদ ফারক হোসাইন খান

অংশ।

দেশে ব্রাহ্মণবাদী সংস্কৃতির সংযোগ বয়ে যাচ্ছে। সরল সহজ মুসলমানদের কোশে হিন্দু মার্কা মুসলমান বানানের অপচেষ্টা চলছে। শেকর সঙ্কানের নামে তাদেরকে এক আল্পাহুর ইবাদতের পরিবর্তে মৃত্তি পূজা, শিব পূজা, গো পূজা, বৃক্ষ পূজা ও অম্বী পূজার সংস্কৃতিতে ফিরিয়ে নেয়ার তৎপরতা চলছে পুরোদেম। জনগণের মন হাজার বছর আগেকার পূর্বপুরুষদের হিন্দু ধর্ম ও ঐতিহ্যমূর্যী করার জন্য নামাজ, রোজা, ঈদ, সবেবরাত, শবে কদর প্রভৃতি পালনের বদলে মঙ্গল প্রদীপ জলে আগুনের কাছে মঙ্গল কামনা, ভাঙ্কথের নামে মৃত্তি তৈরি, পায়রা উড়িয়ে শাস্তি কামনা, দেয়ালী ও হোলি উৎসব প্রভৃতি হিন্দুয়ানী সংস্কৃতিকে সার্বজনীন সংস্কৃতিতে পরিণত করার জন্য মহড়া চালিয়ে যাচ্ছে একটা অসাধু মহল। দেশকে ভারতের হাতে তুলে দেয়া এবং ইসলাম মুক্ত করার জন্য এ মহল তথাকথিত বাঙালী জাতীয়তাবাদ, বাঙালী সংস্কৃতি ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এ সর্বনাশ ত্বিত্বকে মোক্ষম মারণাত্মক হিসেবে ব্যবহার করছে।

ইতিহাস মতে, এদেশের হাজার হাজার বছর আগেকার পূর্ব পুরুষের অধিকাংশ ছিল আনার্য বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। তারা বৃহৎ বাংলার অধিবাসী ছিল। তারা বাংলা ভাষায় কথাবলত। এই ভৌগোলিক ও ভাষাগত দিক দিয়ে তারা বাঙালী হিসেবে পরিচিত। কিন্তু তাদের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে বাঙালা ভাষা বা বঙ্গ দেশের অধিবাসী হিসেবে নয়, বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ অনুসারে। এজন্য তারা জীব হত্যা করা পছন্দ করতো না। বৌদ্ধ পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা প্রভৃতি ধর্মীয় উৎসব উৎযাপন ছিল তাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য।

দাদশ শতাব্দী ও তার পূর্বে বিদেশী আর্য হিন্দু শশাঙ্ক ও সেন বংশের রাজারা রাজশাহি ব্যবহার করে জোর করে এই বৌদ্ধ জনগণের ওপর আর্য বর্ণ হিন্দু সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়। বাংলা ভাষাকে দুর্ভেদ্য সংস্কৃতিমূর্যী করে এর বিকাশ রূপ করে দেয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইসলামের আগমনের সাথে সাথে এদেশের জনমনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধিত হয়। মসজিদ, মাদ্রাসা, নামাজ, রোজা, ঈদ, সবেবরাত ইসলামী নামকরণ হয় তাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। ইসলামের প্রভাবে মুসলমানরা পূর্ব পুরুষদের যাবতীয় কুসংস্কার, মৃত্তি পূজা, জড় পূজা পরিত্যাগ করে। এই মুসলিম আমলেই বাংলা ভাষাকে সহজবোধ্য রূপ দেয়া হয় এবং এর বিকাশ সাধিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী মুসলমানের সংস্কৃতি হয় মুসলিম সংস্কৃতি। তন্মধ্যে বাদবাকী হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাবিত ছিল যথাক্রমে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাবিত সংস্কৃতি। এ সময় মুসলমান মসজিদে যেত, হিন্দু যেত মন্দিরে, বৌদ্ধ প্যাগোড়ায়। মুসলমানরা উৎসব হিসেবে পালন করত ঈদ, হিন্দুরা কালী পূজা-দূর্গা পূজা, বৌদ্ধরা মাঘী পূর্ণিমা। ধর্মহীন বাঙালী সংস্কৃতির ন্যায় অবাস্তব কোন সংস্কৃতির চিহ্ন এ সময়ও ছিল না। অথচ তখন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান একত্রে সুখ-শাস্তি তে বাস করত।

মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয়ের পর ইংরেজ আমলে আর্য হিন্দুরা হঠাতে সরেস বাঙালী সেজে বসে। তারা ইংরেজ রাজশাহির ছত্রায়ায় শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে

মুসলিম প্রভাব মুক্ত করে দুরহ সংস্কৃত শব্দে পূর্ণ করার এবং মুসলিম সংস্কৃতি খৎস করে সর্বত্র হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি কায়েমের কোশেশ চালায়।

গোড়া হিন্দুদের এহেন চরম মুসলিম বিদ্যের ফলে মুসলিম পাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশের অভূদয় ঘটলে স্বত্ত্বাবত্ত বাঙালী মুসলিম সংস্কৃতি তার পূর্বের পথ ধরে। কিন্তু উক্ত মহলের তা' মনোপূত হয়নি। তারা হঠাতে করে আর্য-বর্ণ-হিন্দু সংস্কৃতির প্রেমে পড়ে। তারা আমাদের জাতিসন্তান শেকড় সঙ্কানের নামে, আবহামান কালের দোহাই দিয়ে মঙ্গল প্রদীপ ছালানো, রং ছিটানো, উলু খনি দেয়া, নগপদে শোভা যাত্রা, শাস্তির জন্য পায়রা উড়ানোকে আমাদের সংস্কৃতি বলে প্রচারণার বড় তোলে। ভারতভুক্ত হিন্দু প্রধান বঙ্গ দেশের জনগণের শ্রাব্দ কুড়াবার জন্য ইসলামের আদর্শ ও সংস্কৃতি বিরোধী তৌগোলিক মানচিত্র ও ভাষাভিত্তিক এক উক্ত বাঙালী সংস্কৃতির তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। অথচ কে না জানে, কোন জাতির সংস্কৃতি গড়ে ওঠে মানুষের বিশ্বাসের ওপর ভর করে। তা দেশের আলো-বাতাস, পানিতে শান্তি পালিত হয় মাত্র। কিন্তু কোন জাতির জাতির সংস্কৃতি তার ভাষার অবয়বে মাটি ফুঁড়ে জন্ম নেয় না।

পঞ্চম বঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হিন্দু তাই তারা তেত্রিশ কোটি দেবতায় বিশ্বাস করে, মন্দিরে যায়, কোন কর্ম সম্পাদনের শুরুতে মঙ্গল কামনায় মঙ্গল প্রদীপ ছালায়। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান বলে তারা এক আল্পাহুতে বিশ্বাস করে। সেজন্যে তারা মসজিদে পাঁচবার

নামাজ আদায় করে। কোন কাজের শুরুতে আল্লাহর কাছে মঙ্গল কামনায় 'বিসমিল্লাহ' রাখিম, —বলে কাজ শুরু করে। ধর্ম বিশ্বাসের জন্যই এই পৃথক সংস্কৃতির সূচি হয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থান বা ভাষা পৃথিবীর কোথাও যেমন সংস্কৃতি জন্য দিতে পারেনি তেমনি আমাদের দেশেও সেই আবহান কাল থেকেই ভূগোল বা ভাষাগতভাবে সার্বজনীন কোন বাঙালী সংস্কৃতি গড়ে উঠেনি। এ জন্যই আমরা ভাষা এবং ভৌগোলিক দিক দিয়ে এক বাঙালী জাতি হয়েও আমাদের সংস্কৃতি আলাদা।

কিন্তু এই চরম সত্যকে উপেক্ষা করে ইদনিং ঐ মহল থেকে নাটক, সভা, সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে যে, এ দেশের মুসলমানদের শেকড় তথা 'পূর্ব পুরুষেরা ছিল প্রাচীন বাঙালীর বাঙালী। তাদের সংস্কৃতি ছিল উলু ধৰ্মি, কাসার ধৰ্মি, জড়, গাছ গোমাতা, মূর্তী পূজা। তাদের উত্তর পুরুষ তথা ওপর বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী হিন্দুদের সংস্কৃতিও তাই। শুধুমাত্র মুসলমানরা এসে জোড় করে আমাদের সংস্কৃতি পান্তে দিয়েছে।' এখন আমরা সুযোগ পেয়েছি, এক সংস্কৃতির ধারক হয়ে আমরা আর পৃথক থাকব না। আমরা অখণ্ড বাংলা কায়েম করব।

অখণ্ড বাংলা কায়েমের জন্য আমাদের ধর্ম, আমাদের স্বাধীনতা কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। আমরা মুসলমান এবং পূর্ব পুরুষদের পৌত্রিক সংস্কৃতি বর্জন করে মুসলিম সংস্কৃতির ধারক হয়েছি। এজন্য হিন্দুরা আমাদের সাথে মিলতে চাবে কিনা এটাই তাদের মূল বিবেচ্য বিষয়। তাই দাদাবাবুদের মন জয় করার জন্য তারা আমাদের শেকড় সন্ধানের নামে মুসলমানিত্ব বিসর্জন দিয়ে হিন্দু ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধারণ করার এমন সর্বনাশাউৎসাহিদিছে।

প্রাচীন বাঙালীর এক অংশ ভারতভুক্ত এবং বাকী অংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র। সুতরাং এ অবস্থায় অবিভক্ত বাংলা গঠনের যুক্তিযুক্ত পথ হল ভারতভুক্ত বঙ্গকে ভারত থেকে বিছিন্ন করে

বাংলাদেশের সাথে জুড়ে দেয়ার জন্য সমগ্র বাঙালীর সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ। বিশেষ করে পঞ্চিম বঙ্গের বাঙালীদের এজন্য অগ্রন্তি ভূমিকা নিতে হবে। একটি স্বাধীন দেশের সাথে মিলতে হলে প্রয়োজনে তাদেরই সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ছাড় দিতে হবে। কিন্তু ঐ কাপুরুষ মহল সে যুক্তির পরোয়া না করে আমাদের ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে হিন্দুত্ব বরণ করে পঞ্চিম বঙ্গের হিন্দুদের সাথে মিলিত হওয়ার পক্ষান্তরে ভারতভুক্তির পক্ষে নসিহত বিলাশেন; যেন ওদের সাথে মিলতে পারলেই আমরা নির্ঘাত স্বর্গে চলে যাব।

আমরা জানি, ইসলামের আবিভাবের পূর্বে আরবের লোকেরা মূর্তী পূজা, অগ্নি পূজা ও বিভিন্ন প্রকার কুসংস্কার ও অনাচারে লিপ্ত ছিল। কিন্তু ইসলামের আলোতে তাদের মন এসব কুসংস্কার ও অনাচার মুক্ত হয়। হাজার দেবতার বদলে এক আল্লাহর ইবাদতে মঞ্চ হয়। আল্লাহ, রাসূল, পরকাল, ফেরেশতা, তাকদীর, বেহেস্ত, দোষখ প্রভৃতি ইসলামী ধ্যান ধারণার ওপর ভিত্তি করে তাদের নয়। সংস্কৃতি গড়ে উঠে। একই ভাবে ইসলাম ক্রমান্বয়ে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন ভাষাভাষী—বৰ্ণ ও ধর্মাবলোজী জনগোষ্ঠীর নিকট পৌছে গেলে এসমস্ত জনগোষ্ঠী তাদের বাপ—দাদার নিকট থেকে উত্তরাধিকারস্ত্রে পাওয়া সকল কুসংস্কার, ধর্ম বিশ্বাস ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে, তারা ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী সংস্কৃতি গড়ে তোলে। তাই ভাষা বা ভৌগোলিক অবস্থান ভিত্তির হওয়া সত্ত্বেও সকল মুসলমানের সংস্কৃতি এক ও অভিন্ন। প্রাচ্যের মুসলমান যেমনি বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করে, দাঢ়ি রাখে, টুপি পরে ও পাচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, তদ্বপু পাচাত্য, তুকী বা আফ্রিকার নিয়ে মুসলমানও বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করে, দাঢ়ি রাখে, নামাজ পড়ে, টুপি পরে।

ইসলামের আবিভাবই হয়েছে সকল মিথ্যাকে অপসারণ করার জন্য। এজন্য ইসলাম মানুষের রান্নাঘর থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সুসম পূর্ণজ্ঞ জীবন বিধান উপহার দিয়েছে।

ইসলামের প্রভাবে সকল মিথ্যা, কুসংস্কার দূর হয়ে যাবে এটাই ইসলামের মূল বৈশিষ্ট্য। এজন্যই কোন মিশরীয় মুসলমান তাদের শেকড় সন্ধানের নামে বলছে না যে, আমরা মুসলমান থাকব কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি হবে পিরামিড সংস্কৃতি। আমরা পুনরায় আল্লাহর পরিবর্তে ফেরাউনকে খোদা মেনে তার পূঁজা করব। কোন পাকিস্তানী বা ইরাকী মুসলমানও দাবী করছে না যে, আমরা মুসলমান কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি হওয়া উচিত পৌত্রিক ভাবধারার সিদ্ধু বা বেবিসনীয় সংস্কৃতি। অথচ আমাদের দেশে বাঙালী সংস্কৃতির ধূমজাল সৃষ্টি করে মুসলমানদের শেকড় তথা পৌত্রিক ভাবধারাদী সংস্কৃতিমূখ্য করার দাবী জানানো হচ্ছে। আল্লাহর পরিবর্তে মঙ্গল প্রদীপের আগুনের কাছে মঙ্গল কামনা করে তাদের শিরকে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োচণা দেয়া হচ্ছে।

ইসলামের নবী, সত্যের নবী (সা:) যখন পৌত্রিক আরবদের সত্যের পথে দাওয়াত দিলেন তখন কিন্তু সংখ্যক পৌত্রিক তাদের বাপ—দাদার স্ত্রে পাওয়া ধর্ম ও কুসংস্কারকে ইসলামের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে তা' প্রত্যাখ্যান করে। এদের সর্দার আবু জাহেলে ও আবু লাহাব ইসলাম গ্রহণকারীদের প্রতি দৈহিক শক্তি প্রয়োগ, হমকী, তয়—ভীতি প্রদর্শন করে বাপ—দাদার মূর্তী—সংস্কৃতিতে ফিরিয়ে আনার প্রাণান্ত চেষ্টা করে। সেই আবু জাহেলের এদেশীয় অনুসারীরাও এ দেশের মুসলমানদের মুসলমানিত্ব খতম করে দিয়ে তাদের বাপ—দাদার মূর্তী সংস্কৃতিতে ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছে। ইসলাম অপেক্ষা মূর্তী পূজা, গাছ পূজার মাধ্যমে শিরকে লিপ্ত হতে পছন্দ করছে। ইসলামের ওপর বাপ—দাদার কুসংস্কারকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার কোশেশ করছে। ওদের উদ্ধৃত মতের সমর্থনে প্রচার মাধ্যমে প্রচারণার ঝাড় তোলার অপচেষ্টা চলছে। এদের প্রচার, প্রোপাগাণ্ডা সম্পর্কে আমাদের সতর্ক হতে হবে, সহজ সরল মুসলমানদের ওদের শয়তানী দাওয়াত থেকে সতর্ক করতে হবে। কোথায় সেই সাইরেনওয়ালা হিয়বুল্লাহর দল?

# হ্যরত বায়জীদ বোন্টামীর ইলমী কাব্যাল

জসীম উদ্দীন খান পাঠান

হ্যরত বায়জীদ বোন্টামী (রঃ) ছিলেন একজন উচ্চরের আধ্যাত্মিক সাধক। শ্রম, ত্যাগ, এবাদত ও তাকওয়া দ্বারা তিনি কারামাতের অধিকারী হয়েছিলেন। ইল্ম ও মারফতের এই উচ্জল জোতিকের জন্ম ইরানের বোন্টাম শহরে। মাত্তুকি এবং মাতৃ সেবার অভূতপূর্ব দ্রষ্টান্ত স্থাপন করে তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। আরও অচেরে বিষয়, মুসলিম অমুসলিম নিরিশে সকল ধর্মানুসারীদের নিকট তিনি সমানভাবে সমাদৃত এবং তার আধ্যাত্মিকতার ব্যাপক প্রভাব পরিস্কিত হয় সকল শ্রেণীর লোকের মাঝে। দুনিয়ার মানুষ একজন আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে তাঁর নাম অতি প্রদ্বার সাথে শরণ করে।

হ্যরত বায়জীদ (রাহঃ) একদিন মোরাকাবায় (ধ্যান) ঘণ্টা। এমন সময় এলহাম (আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্তরে উদয়) হলো যে, হে বায়জীদ! ইহুদীদের পোশাক পরে দেরসাম্যান-এ (ইহুদীদের একটি উৎসব অনুষ্ঠানের স্থানের নাম) যাও। তুমি তাদের আনন্দোৎসবে যোগদান কর।

হ্যরত বায়জীদ প্রথম এইরূপ এলহাম দ্বারা ঘাবড়ে যান। কিন্তু বার বার একই এলহাম হতে থাকলে অবশেষে তিনি ইহুদী পোশাক পরে সে উৎসবে যোগদানে। অনুষ্ঠানে এলাকার সকল ইহুদী জমায়েত হয়েছে। তার সাথে সাথে ইহুদী শ্রেণীর বড় বড় পশ্চিত, শাস্ত্রজ্ঞ এবং যাজকগণও উপস্থিত হয়েছে। সব শেষে তাদের সর্বোচ্চ শাস্ত্রজ্ঞ-পশ্চিত এবং পুরোহিত সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করার জন্য দাঢ়ান। কিন্তু তিনি দাড়িয়ে কোন কথা বলতে পারছেন না। তাঁর মুখে ধর্মের কথা ফুটছে না। দাড়িয়ে বোকার মত এদিক

সেদিক তাকাচ্ছেন। অদৃশ্য শক্তির প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করে সে হতবিহবল হয়ে উঠে। দীর্ঘক্ষণ এভাবে দাড়িয়ে থাকলে শ্রেতাদের মধ্যে তার ব্যাপারে গুঞ্জন উঠে। তারা তাঁর নিকট এর কারণ জিজ্ঞেস করলে নিজের অবস্থা ও ব্যার্থতা চেপে রেখে বুদ্ধিমানি করে শ্রেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের এ জমায়েত হলে অবশ্যই কোন মুহাম্মদী (মুহাম্মদ সাঃ)-এর অনুসারী। উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং এ কারণেই আমি বক্তৃতা করব না।

একথা শুনে উপস্থিত শ্রেতারা উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং সমস্তের বলতে থাকে, আপনি অনুমতি দিন, আমরা তাকে খুজে বের করে মেরে ফেলব। রাহের বঞ্চি, কোন অন্যায় বা যুক্তিক্রুক্ত কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করা ঠিক নয়। বরং প্রথমে তোমরা তার সাথে মত বিনিময় কর এবং তাকে হত্যা যোগ্য প্রমাণিত করে মেরে ফেলতে পার—এর আগে নয়। সকলে এবার লোকটিকে খুজতে লাগল। ইতিমধ্যে রাহের দাঁড়িয়ে বঞ্চি, হে মুহাম্মদের (সাঃ) অনুসারী! তোমাকে তোমার নবীর দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি যেখানে বসে আছো সেখানেই দাঁড়িয়ে যাও। তুমি যদি আমাদের উত্থাপিত প্রশ্ন সম্মুহের সঠিক উত্তর দিতে পার তবে আমরা তোমার অনুসরণ করব। আর ইসলাম সম্পর্কে যে সব সন্দেহ আমাদের মনে রয়েছে সেগুলো দূরীভূত করতে সক্ষম না হলে তোমাকে আমরা হত্যা করব।

এই আহবান শুনে হ্যরত বায়জীদ বোন্টামী (রঃ) উঠে দাঁড়ান। উপস্থিত সকলে তাঁকে উৎসুক নেত্রে দেখতে থাকে।

রাহেবঃ হে মুহাম্মদী! আমরা তোমাকে

কয়েকটি প্রশ্ন করব, যদি উত্তর দিতে পার তবে আমরা তোমার কথা শুনব এবং তোমার ধর্মের অনুসরণ করব। যদি যথাযথ উত্তর প্রদানে ব্যার্থ হও তাহলে তোমাকে এই মজলিসেই হত্যা করা হবে। হ্যরত বায়জীদ (রঃ) বঙ্গেন, আচ্ছা আপনাদের প্রশ্ন কি বলুন।

রাহেবঃ জানতে চাই, সে এক কি যার কোন দ্বিতীয় নেই?

বায়জীদঃ আল্লাহ এক যৌর কোন দ্বিতীয় নেই।

রাহেবঃ সে দুই কি যার তৃতীয় নেই?

বায়জীদঃ সেই দুই হল রাত এবং দিন যার তৃতীয় নেই। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেনঃ “আমি রাত ও দিনকে দুটি নির্দশন স্বরূপ বানিয়েছি।” (বনী ইসরাইলঃ ১২তম আয়াত)

রাহেবঃ এমন তিনটি জিনিস কি যার চতুর্থ নেই?

বায়জীদঃ আরশ, কুরসি ও কলম।

রাহেবঃ এমন চারটি জিনিস সম্পর্কে অবগত করুন যার পঞ্চম নেই?

বায়জীদঃ তাওরীত, ইঞ্জিল, যবুর, কুরআন।

রাহেবঃ সে পাঁচটি বিষয় কি যার ষষ্ঠম সংখ্যা নেই?

বায়জীদঃ পাঁচ ওয়াকের ফরজ নামাজ।

রাহেবঃ আমি জানতে চাই সে ছয়টি বিষয় সম্পর্কে যার সপ্তম সংখ্যা নেই?

বায়জীদঃ ঐ ছয়টি দিন যে দিন শুগুলোতে আল্লাহ পাক আসমান জমীন সৃষ্টি করেছেন।

“পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ ‘আর আমি

আসমান জমিন এবং এ দুয়ের অভ্যন্তরীণ  
সকল বস্তুকে হয় দিনে সৃষ্টি করেছি।”  
(কাহাফঃ ৩৮)

রাহেবঃ সে সাতটি জিনিস সম্পর্কে বলুন  
যার অষ্টম সংখ্যা নেই?

বায়জীদঃ সাত আসমান। “আল্লাহ পাক  
বলেছেন: “তোমরা কি দেখনা যে, আল্লাহ  
তায়ালা কেমনে স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ সৃষ্টি  
করেছেন?” (নূহঃ ১৫)

রাহেবঃ সে আটটি জিনিস কি যার নবম  
তম সংখ্যা নেই?

বায়জীদঃ আরশ বহনকারীগণ। যথা  
কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে, “এবং ঐ দিনে  
আগন্তর প্রভুর আরশকে আটজন ফেরেশতা  
বহন করবে।” (হাকুহঃ ১৭)

রাহেবঃ সে নয়টি জিনিস কি যার দশম  
সংখ্যা নেই?

বায়জীদঃ হ্যরত সালেহ (আঃ)-এর  
এলাকার নয়টি বক্তী যাতে সন্ত্রাসী ও ফাসাদ  
সৃষ্টিকারীরা বাস করত। “সেই জনপদে  
নয়জন গোত্রীয় সরদার লোক ছিল যারা  
সমাজে সন্ত্রাস ও অশাস্তি সৃষ্টি করেছিল।  
আদৌ তারা শাস্তি স্থাপন করছিল না।”  
(নমলঃ ৪৮)

রাহেবঃ “আশারায়ে কামেলা” অর্থাৎ পূর্ণ  
দশটি জিনিস দ্বারা কি বুঝায়?

বায়জীদঃ যে ব্যক্তি তামাতু হজ্জ আদায়  
করবে কিন্তু কোরবানী করতে অক্ষম হবে  
তাকে দশটি রোধা রাখতে হয়। দশ দিনের  
সে দশটি রোধাকে “আশারায়ে কামেলা”  
বলা হয়। যেমন এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে  
বলা হয়েছে: “আর যে ব্যক্তি কোরবানীর  
গুণ সঞ্চাহ করতে পারবে না তার জন্য  
হজ্জের সময় তিনটি রোধা এবং সাতটি রোধা  
হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় আদায় করতে  
হবে। এভাবে মোট দশটি পূর্ণ হবে।”  
(বাকুরাঃ ১৯৬)

রাহেবঃ সেই এগারটি, বারটি এবং

তেরটি বস্তু কি কি?

বায়জীদঃ হ্যরত ইউসুফ (আঃ)-এর  
এগার তাই এবং বার মাস। “নিশ্চয়ই মাস  
সমূহের সংখ্যা আল্লাহ তা’আলার নিকট  
ধার্যকৃত ভাবে বারটি।” (তত্ত্বাঃ ৩৬)

এবং ইউসুফ (আঃ) ব্রহ্মে তেরটি  
জিনিসকে সেজদা করতে দেখেছিলেন।  
“আমি ব্রহ্মে এগারটি তারকা এবং সূর্য ও  
চন্দ্ৰকে আমায় সেজদা করতে দেখেছি।”  
(ইউসুফঃ ৪)

রাহেবঃ ঐ দশটি কারা যারা মিথ্যা  
বলেছিল অথচ বেহেশতে যাবে এবং ঐ  
দশটি কারা যারা সত্য কথা বলছে কিন্তু  
জাহানামে যাবে?

বায়জীদঃ হ্যরত ইউসুফ (আঃ) এর  
তাইয়েরা মিথ্যা বলেছিল কিন্তু তার পরও  
তাঁরা জানাতে যাবে।

“হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়  
প্রতিযোগিতায় ছিলাম এবং ইউসুফকে  
আমাদের আসাব পথের নিটকে রেখে  
পিয়েছিলাম।” (ইউসুফঃ ১৭)

ইহুদী এবং খৃষ্টান এরা পরম্পরে  
একদল আরেক দলকে মিথ্যাবাদী বলে যে  
দোষারোপ করে তা সত্য বিষয় কিন্তু তার  
পরও তারা উভয় সম্প্রদায় জাহানামে যাবে।

“এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা  
হয়েছে: “এবং ইহুদীরা বলে খৃষ্টান ধর্ম  
কোন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তন্মুগ  
খৃষ্টানাও বলে ইহুদীরা কোন ভিত্তির উপর  
নেই; অথচ তারা সকলেই আসমামী কিতাব  
পড়ে এবং এর অনুসৰী বলে দাবী করে।”  
(বাকুরাঃ ১১৩)

রাহেবঃ যারিয়াত, হামিলাত, জারিয়াত,  
মুকাস্সিমাত এই শব্দ গুলোর অর্থ কি?

বায়জীদঃ যারিয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য বাতাস,  
হামিলাত দ্বারা পানি জমাট মেঘ মালা,  
জারিয়াত দ্বারা জাহাজ এবং মুকাস্সিমাত  
দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ফেরেশতা যিনি ১৫ই শাবান

থেকে আগামী মধ্যবর্তী শাবান (এক বছর)  
পর্যন্ত বাদীর রিয়িক পৌছে দেয়ার দায়িত্ব  
সম্পাদন করেন। “সে বাতাসের শপথ যা ধু-  
লিবালু উড়িয়ে নেয় এবং সেই মেঘ পুঁজের  
শপথ যা বোঝা বহন করে, অতঃপর সেই  
জলযানের (জাহাজের) যা স্বাচ্ছন্দ গতিতে  
চলে আর সেই ফেরেশতা সমূহের শপথ  
যারা বস্তু সমূহ বটেন করে।” (যারিয়াতঃ ১,  
২, ৩, ৪)

রাহেবঃ সেই বস্তুটি কি যা শাস নেয়  
অর্থ তার রাহ নেই?

বায়জীদঃ সুবহে সাদেক। যার মধ্যে রাহ  
নেই কিন্তু সে শাস নেয় বলে উল্লেখিত  
হয়েছে। “এবং প্রভাতের কসম, যখন সে  
শাস নেয় (আগমন করে)।” (তাকবীরঃ ১৮)

রাহেবঃ আমি আগনার নিকট থেকে সে  
চৌদটি বস্তু সম্পর্কে জানতে চাই যারা  
আল্লাহ তায়ালার সাথে কথা বলার সৌভাগ্য  
অর্জন করেছিল।

বায়জীদঃ সাত আসমান এবং সাত  
জীবন। “অতঃপর তিনি আসমান জীবনকে  
বললেন, তোমরা অনুগত হয়ে আস,  
স্বাচ্ছন্দে হোক অথবা অনিষ্টাকৃতভাবে  
হোক। উভয়ে বলো, আমরা স্বাচ্ছন্দে  
উপস্থিত আছি।” (হা-মীম সেজদাহঃ ১১)

রাহেবঃ সে কবর কোনটি যে তার  
তিতরকার ব্যক্তিকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিল?

বায়জীদঃ হ্যরত ইউনুস (আঃ)-কে যে  
মাছটি গিলে ফেলেছিলো। “শেষে একটি  
মাছ তাঁকে গিলে ফেলো এবং তিনি  
নিজেকে তখন ধিক্কার দিচ্ছিলেন।”  
(সাফুতাত ১৪২)

রাহেবঃ ঐ পানি কোথায় যা আকাশ  
থেকে বর্ষিত হয়নি এবং মাটি থেকেও  
উন্নিত হয়নি?

বায়জীদঃ হ্যরত সুলায়মান (আঃ) রাণী  
বিলকিসের জন্য যে পানি পাঠিয়েছিলেন  
সেটা ছিল মূলত ঘোড়ার ঘাম। যা আকাশ

থেকে নামেনি এবং মাটির নিচ থেকে উঠান হয়নি।

রাহেবঃ সে চারটি বস্তু কি যা না তার মার পেট থেকে জন্মেছে না পিতার পিঠ থেকে?

বায়জীদঃ হ্যরত ইসমাইল (আঃ)-এর দুষ্টা, হ্যরত সালেহ (আঃ)-এর উচ্চনি এবং হ্যরত আদম ও হাওয়া (আঃ)।

রাহেবঃ সর্ব প্রথম কার রক্ত পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়?

বায়জীদঃ হাবিলের রক্ত। কাবিলই তার ভাইকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে সর্ব প্রথম বনী আদমের রক্ত মাটিতে প্রবাহিত করে।

রাহেবঃ আমি এমন একটি বিষয়ে আপনাকে প্রশ্ন করব যা আল্লাহ নিজেই সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তিনি সেটাকে ক্রয় করেছেন।

বায়জীদঃ মুমিন বাস্তুর জীবন। যা আল্লাহ পাক সৃষ্টি করার পর ক্রয় করে নিয়েছেন। “নিশ্চয়ই আল্লাহ তা’আলা ক্রয় করে নিয়েছেন মুমিনদের জীবন ও সম্পদ বেহেশতের বিনিময়ে।” (তওবাৎ ১১১)

রাহেবঃ সে জিনিসটি কি যা আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তার নিন্দা করেছেন?

বায়জীদঃ গাধার আওয়াজ। “নিশ্চয়ই আওয়াজ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে কর্কশ আওয়াজ হল গাধার।” (লুকমান ১৯)

রাহেবঃ আল্লাহ তায়ালা কোন জিনিসকে সৃষ্টি করার পর তার চরিত্রের একটি বিষয়ে আশংকা করেছেন?

বায়জীদঃ নারীর ছলনা। “নিশ্চয়ই তোমাদের (নারীদের) ছলনা তারী ভয়ংকর।” (ইউসুফ ২৮)

রাহেবঃ সে বস্তুটি কি যা আল্লাহ তায়ালা নিজে সৃষ্টি করেছেন এবং সে সম্পর্কে অন্যের নিকট পরিচয় জানতে চেয়েছেন?

বায়জীদঃ হ্যরত মুসা (আঃ)-এর লাঠি। যা ছিল তাই সৃষ্টি কিন্তু তার পর এ সম্পর্কে মুসা (আঃ)-কে, জিজেস করেছিলেন: “হে মুসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি? তিনি বলেন, এটা আমার লাঠি।” (তোহাঃ ১৭, ১৮)

রাহেবঃ নারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান কে কে? এবং নদীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কোন কোনটি?

বায়জীদঃ রমনীদের মধ্যে হ্যরত হাওয়া, খাদিজাতুল কোবরা, আয়েশা, আসিয়া, ফাতিমা, মারাইয়াম সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারীনী এবং সমুদ্রের মধ্যে যায়হুন, সায়হুন, দজলা, ফোরাত ও নীল শ্রেষ্ঠ।

রাহেবঃ শ্রেষ্ঠ পাহাড় এবং সর্বোত্তম পশু কোনটি?

বায়জীদঃ পাহাড়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুর এবং সর্বোত্তম পশু হল ঘোড়া।

রাহেবঃ হে মুহাম্মদী (সাঃ)! বগুন সর্বোত্তম মাস এবং শ্রেষ্ঠ রাত কোনটি?

বায়জীদঃ সর্বোত্তম মাস রমযান। “রমযান মাস যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।” (বাক্সারাঃ ১৮৫) এবং সর্বোত্তম রাত হল শায়লাতুল কদর। “শায়লাতুল কদর এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।” (কদরঃ ৩)

রাহেবঃ একটি গাছের বারটি ডাল, প্রতি ডালে ত্রিশটি পাতা, প্রতিটি পাতায় পাঁচটি ফুল, তন্মধ্যে দুইটি ফুলের অবস্থান স্বর্ণালোতে এবং তিনিটির অবস্থান ছায়ায় সূতরাং বগুন গাছটি কি?

বায়জীদঃ গাছ দ্বারা উদ্দেশ্যে বছর। তন্মধ্যে বারটি মাস রয়েছে এবং প্রতি মাসে ত্রিশ দিন এবং প্রতি দিনে রয়েছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। তন্মধ্যে দুই ওয়াক্ত অর্থাৎ জোহর ও আসর পড়তে হয় স্বর্ণালোতে বাকী তিন ওয়াক্ত ছায়ায় অর্থাৎ স্বর্ণালোতের পর।

রাহেবঃ সে বস্তুটি কি যে বায়তুল্লাহ

শরীকে পৌছার পর হজ্জ করেছে অথচ তার প্রাণ নেই এবং তার উপর হজ্জ ফরজও নয়?

বায়জীদঃ হ্যরত নুহ (আঃ)-এর জাহাজ বন্যায় ডেসে ডেসে জজীরাতুল আরব পৌছলে বায়তুল্লাহ শরীফ প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু তখন বায়তুল্লাহ পানির নীচে ডুবত ছিল।

রাহেবঃ আল্লাহ তায়ালা কতজন নবী পাঠিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে কতজন নবী এবং কতজন রাসূল?

বায়জীদঃ এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহই রাখেন। তবে যতটুকু জ্ঞান পেছে পয়গাঁওরগণের সংখ্যা এক লাখ ছবিশ হাজার। তন্মধ্যে তিনশ” তের জন ছিলেন রাসূল বাকী সকলে নবী।

রাহেবঃ সে চারটি জিনিস কি যেগুলোর মূল এক কিন্তু রং ও সাধ তিনি ভিন্ন?

বায়জীদঃ সে চারটি বস্তু হল নাক, কান, চোখ ও মুখ থেকে নিশ্চৃত তরল বস্তু সমূহ। কান থেকে নিশ্চৃতি পানির সাদ হল তিক্ত, অশ্রুর সাদ হল লবনাক্ত, মুখের থুথু হল মিষ্টি, নাকের প্রেৰার সাদ টক।

রাহেবঃ ‘কিতমীর’ এবং ‘ফাতীল’ শব্দ দুটির ব্যাখ্যা দিন।

বায়জীদঃ খেজুর দানার পেছনের যে অংশটুকু সাদা হয় তাকে বলে নাকীর এবং খেজুর বিচির উপরের সাদা হালকা চামড়াটাকে বলে কিতমীর এবং বিচির জোড়া স্থানে যে হালকা সাদা পর্দা থাকে তাকে বলে ফাতীল।

রাহেবঃ সুবাদুন এবং শুবাদুন শব্দের অর্থ কি?

বায়জীদঃ বকরী এবং ভেড়ার পশমকে সুবাদ ও শুবাদ বলে।

রাহেবঃ বগুন, হাম এবং রাম কাদের নাম?

বায়জীদঃ হয়রত আদম (আঃ) এর পূর্ববর্তী উচ্চতরগণের নাম ছিল হাম এবং রাম।

রাহেবঃ সে প্রাণীটির নাম কি যার নিকট আল্লাহ ওই পাঠিয়েছিলেন, অথচ সে মানুষ, জীব, ফেরেশতা কোন প্রজাতিরই নয়?

বায়জীদঃ মধু মক্ষিকা। “আর আপনার রব মধু মক্ষিকার অন্তরে এ কথা দেলে দিলেন যে, তুমি গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষ রাজিতে এবং মানুষের অট্টালিকাগুলোতে।” (নহলঃ ৬৮)

অতঃপর হয়রত আবু ইয়াজিদ (বায়জীদ) (রঃ) বলপেন, আরো কোন প্রশ্ন থাকলে বলুন। কিন্তু রাহেব অক্ষমতা প্রকাশ করে বল্পো, আমার নিকট জিজ্ঞাস্য আর কিছুই নেই। অতপর হয়রত বায়জীদ (রাহঃ) বল-

লেন, আমি আপনাকে শুধু মাত্র একটি প্রশ্ন করব। সুতরাং শুধু একটি প্রশ্নের উত্তর দিন যে, আসমান এবং বেহেশতের চাবি কি?

প্রশ্নটি শুনা মাত্র পুরোহিত বিশ্বে হতবাক হয়ে রইল। হয়তর বায়জীদ উপস্থিত সকলকে সক্ষ্য করে বলপেন, আমি তোমাদের পুরোহিতের এতগুলো প্রশ্নের উত্তর দিলাম কিন্তু সে আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না!

একথা শুনার পর রাহেব বল্পো, আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম কিন্তু আশংকা যে, আমার কথার সাথে উপস্থিত সকলে একমত হবে না। একথা শুনে সকলে সমস্তেরে আওয়াজ দিল, আপনার কথার সাথে আমরা একাত্মতা জানাব। যদি কোন হক কথা হয় তবে আমরা অবশ্যই সমর্থন করব। আপনি আমাদের শাস্ত্রজ্ঞ, পুরোহিত, দলপতি

আর আমরা আপনার অনুসারী সুতরাং সত্য কিছু থাকলে বলে ফেলুন। তখন রাহেব পরিস্কার ভাবে ঘোষণা দিলেন, বেহেশতের চাবি হল, “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্” — একমাত্র আল্লাহই সত্য মাবুদ এবাদতের যোগ্য এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁরই সর্বশেষ প্রেরিত রাসূল।

রাহেবের মুখ থেকে এ ঘোষণা শুনা মাত্র সকলে ইসলাম গ্রহণ করার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে এবং হয়রত বায়জীদ বোঙ্গামীর (রঃ) হাতে সকলে ইসলাম গ্রহণকরে।

অতঃপর হয়রত বায়জীদ বোঙ্গামীর অন্তরে আবার এলহাম হল, হে বায়জীদ! তুমি আমার আদেশ পালন করার খাতিরে হাজার হাজার ইহুদীকে আমি খুশী হয়ে ইসলামের সূচীতল ছায়ায় আশ্রয় দিলাম।

## খুলাফায়ে রাশেদীনের সঠিক ইতিহাস ও খেলাফত ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে হলে পড়ুন তারীখে মিল্লাত ২য় খণ্ড

অনুসন্ধিসু পাঠক সাধারণ শিক্ষার্থীদের চাহিদা মেটাতে প্রকাশিত হয়েছে উর্দু ভাষায় লিখিত ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাব তারীখে মিল্লাত (২য় খণ্ড) এর বাংলা সংস্করণ

### অনুবাদঃ মাওলানা লিয়াকত আলী

ফাযেলে জামেয়া লালবাগ  
বি, এ, অনাস, সাংবাদিকতা  
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,  
মুহাম্মদপুর, মাদ্রাসাদারুররাশাদ।

### প্রাণিস্থান

মাদ্রাসা দারুর রাশাদ  
১২-ই মীরপুর, ঢাকা-১২২১  
ফোনঃ ৮০৩১৬৩

# মরণজয়ী মুজাহিদ

মর্মিক আহমাদ  
সরওয়ার

(৪)

যোল বছর বয়সের আলী অর সময়ের মধ্যে গেরিলা সড়াইয়ে পারদর্শী হয়ে উঠে। মারকাজের সকল মুজাহিদের নিকট সে দুর্ধর্ষ মুজাহিদ বলে পরিচিত। কমাণ্ডার তাকে সম্মুখবর্তী ফ্রন্টে নিয়োগ করেন। সেখানে দুটি উচু উচু পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে তাদের ঘাঁটি পাহাড়ে প্রচুর গাছপালা থাকায় দূর থেকে তা ঘন জঙ্গল বলে মনে হয়। পাহাড় দু'টি আরও কিছুদূর যেয়ে এক সাথে মিলে গেছে। সেখান থেকে একটি ঝঁঁণা ধারা প্রবাহিত হয়ে শ্রোতের সৃষ্টি করে দুই পাহাড়ের মাঝে দিয়ে বয়ে গেছে। শ্রোতধূরার দুই পাশে মোজাহিদের সারিবদ্ধ মরিচা।

এই পাহাড় থেকে আট মাইল দূরে আরও উচু পাহাড়ের উপর দুশ্মনের ঘাঁটি মুজাহিদো সেই ঘাঁটিটির পতন ঘটাতে অগ্রসর মান। এক রাতে আলী সহ বিশজন মুজাহিদ অঙ্কারে আকস্মিক হামলার জন্য সেদিকে রওয়ানা হয়। তারা ধীরে ধীরে দুশ্মনের পোষ্টের কাছাকাছি যেয়ে পৌছে।

রশ্ম সৈন্যরা পোষ্টের আশে পাশে মাইন বিছিয়ে রেখেছে। মাইন অনেক প্রকারের। কোন কোন গুলো বড় আকারের। যখন ট্যাঙ্ক এর উপর দিয়ে চলে তখন তা বিফোরিত হয়ে ট্যাঙ্ককে ধ্বংস করে দেয়। অন্য গুলি

পদাতিক বাহিনীর অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে পেতে রাখা হয়। এগুলো আকারে ছোট। বিভিন্ন কৌশলে এসব পুঁতে রাখা হয়। কোন কোনটি মাটির সামান্য নিচে বিছানো থাকে। যদি ভুল ক্রমে কারো পা এর উপর পড়ে তবে সাথে সাথে বিফোরিত হয়ে পা উড়িয়ে নিয়ে যায়। এক প্রকারের মাইন বোপ ঝাড়ের মধ্যে পুঁতে রেখে স্লা টিকন তার টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। কারো পায়ের সাথে তারের টান পড়লেই ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে এর কণাগুলো দূর দূরান্ত পর্যন্ত ছুটে যেয়ে গায়ে বিন্দু হয়। এছাড়া রয়েছে ইলেক্ট্রনিক মাইন। যা মাটির গভীরে অনেকগুলো এক যায়গায় পুঁতে রাখে। মাটির নীচ দিয়ে এর সাথে তার সংযুক্ত করা হয়। যখনই কোন গ্রাফ এই জায়গায় আসে তখন বেটারী চার্চ দিয়ে একই সঙ্গে সবগুলি বিফোরিত করা হয়। রশ্মিরা অন্য এক প্রকার মাইনও আফগানিস্তানে ব্যবহার করেছে। যার রং ও আকার পাথরের মত। অসংখ্য বিক্ষিণ পাথরের মধ্যে এই মাইনগুলো সন্তুষ্ট করা কঠিন। যার ফলে এর দ্বারা অসংখ্য মুজাহিদ হতাহত হয়েছে। আলীদের গ্রাফ আক্রমণের জন্য শত্রুদের পোষ্টের কাছে পৌছতেই একজনের পা মাইনের ফাঁদে পড়ে যায়। বিফোরণের শব্দ শুনতেই রশ্ম সৈন্যরা সেইদিকে অঙ্কের মত গুলি ছুঁতে থাকে। ফলে তারা পিছনে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। ফেরার পথে কয়েকজন মুজাহিদ আঁহত হয়। নিরাপদ জায়গায় জমায়েত হয়ে দেখে দুজন সাথী নেই। কমাণ্ডার ঐ দুই মুজাহিদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আবুসুলাহ নামক এক মুজাহিদ বলে এরা দুজনই মাইনের উপর পড়েছে। সংজ্ঞাবতঃ তারা শহীদ হয়ে গেছে।

মুজাহিদো তাদের শহীদ সাথীদের সাথে কখনও দুশ্মনদের এলাকায় ফেলে আসে না। সাথে উদ্ধারের জন্য তারা দ্বিতীয়বার হামলা

চলায়। দুমশন প্রস্তুত ছিল। এ আক্রমণে আরও দু'জন মুজাহিদ শহীদ হলেও তারা শাশ আনতে ব্যার্থ হয়।। দুশ্মনদের পোষ্ট বিজয় না করা পর্যন্ত শাশ আনা সম্ভব নয়। কমাণ্ডার যাচ্ছে আলীসহ পাঁচজন মুজাহিদকে সাশ হেফাজতের জন্য রেখে বাকীদের নিয়ে মারকাজে ফিরে যান। এরা মরিচা বানিয়ে দূর থেকে সাশ পাহাড়া দিতে ছিল। কোন সৈনিক এদিকে অগ্রসর হলে গুলি করে তার পথ রুক্ষ করা হত। এভাবে কয়েকদিন চলে গেল। এরা রাতে মুজাহিদেরা কামান দ্বারা দুশ্মনের পোষ্টের ওপর গোলা বর্ষণ করে যাতে তারা পোষ্ট খালী করে চেলে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু এবারও তেমন ফল হল না। তাদের পোষ্ট ছিল অনেক উচুতে। মুজাহিদের গোলা তাদের তেমন ক্ষতি করতে পারেনি। অপর দিকে মুজাহিদের মরিচার অবস্থান সক্ষ্য করে রশ্ম সৈন্যরা ভারী তোপ বর্ষণ করে। তোপের আঘাতে একজন মুজাহিদ শহীদ ও কয়েকজন যথমী হয়।

মুজাহিদো বড়ই পেরেসান। দিনে হামলা করলে স্পষ্ট দেখা যায়; রাতে গোলার শব্দ ও আলোক রশ্মিতে মরিচার অবস্থান নির্ণয় করা যায়। কোন প্রকারেই সাশ আনা গেল না। দুমশনের এলাকায় শহীদদের সাথে পড়ে থাকবে তা আবুসুলাহ উজ্জিবীত আফগান মুজাহিদের বরদাস্ত হচ্ছিল না। আরো কিছু দিন এভাবে চলে গেল। আক্রমণ চালালে শত্রুর চেয়ে নিজেদেরই বেশী ক্ষতি হয়।

এক দিন আলী কমাণ্ডারের কাছে যেয়ে বস্ত্রো, আমার কাছে একটি কৌশল আছে। যদি আপনি অনুমতি দেন তবে তা প্রয়োগ করে দেখতে পারি। ইনশায়াল্লাহ প্রথম পদক্ষেপেই আমরা সাশ উদ্ধার করতে সক্ষম হব। আশা করি এ পরিকল্পনার আওতায় পরবর্তিতে পোষ্টে দখল করা যাবে।

কমাণ্ডার আলীর কাছে তার পরিকল্পনার

ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। আলী তাকে মোটামুটি ধারণা দিয়ে বল্লো, আর যা করব তা ওই সময় তাংকনিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে। একথা যেন আপনি কাউকে না জানান। আমাদের মধ্যে দুশ্মনেদের গুপ্তচর শুকিয়ে থাকতে পারে।

কমাণ্ডার আলীকে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অনুমতি দেন। আলী তার এই অপারেশনের নাম বিখ্যাত মুসলিম গেরিলা মুজাহিদ ইমাম শামিলের নামে ‘শামিল’ নাম রাখে। এরপর ছোট খাট পরীক্ষা নিরীক্ষার পর পাঁচজন বাছাই করা মুজাহিদ নিয়ে অগ্রসর হয়। সাথে নেয় ভূমি থেকে ভূমিতে নিষ্কেপন যোগ্য রকেট — যাকে মুজাহিদরা রকেট মিজাইল বলে। সাথে নেয় ছয়টি খালী টিনের ডিবা, প্রয়োজনীয় ব্যাটারী ও বৈদ্যুতিক তারসহ অন্যান্য সামগ্রী।

কারো বুবো আসছিল না, আলী কিভাবে ঐ খালী টিনের ডিবা দিয়ে শহীদদের শাশ উদ্ধার করে আনবে। কিন্তু আলী কারও উপহাস ও সমালোচনায় কান দিছে না। রশি পোষ্টের এক মাইল দূর থেকে আলী শাশের দিকে যাওয়ার পরিবর্তে পোষ্টের অপর দিকে চলে আসে। পোষ্ট থেকে এক কিলোমিটার দূরে সাথীদের নিয়ে একটি ঝোপের আড়ালে বসে পড়ে। প্রায় ঘন্টা খালেক ধরে আলী আশ-শাশের অবস্থান ও পোষ্টের দূরত্ব পর্যবেক্ষণ করে। এর পর সাথীদেরকে টিনের ডিবায় পানি ভরে আনতে বলে। সাথীরাতো হেসে খুন। এর আগে হাল্ক খান নামক একজন মুজাহিদ হেসে হেসে বলেছিল, তুমি কি রশদেরকে পাতিকাক ভেবেছো যে টিনের ডিবায় শব্দ করলে তারা ভয়ে পালিয়ে যাবে? আলী মৃদু হেসে বলেছিলো, কাক তো তাল, উদেরকে তো আমি পাতি শৃঙ্গালের চেয়েও তীব্র মনে করি। পানি আনতে বলায় হাল্ক খান এবার বল্লো, ‘তুমি কি এদের ডিবার পানির মধ্যে ডুবিয়ে মারবে? আলী মুখ শক্ত করে বল্লো, “এদেরকে আমি এত কাপুরুষ ভাবিনা যে,

এরা এর মধ্যে ডুবে মরবে। বরং তাদের দাফনকরার পূর্বে গোসল দেওয়ার জন্য পানি আনতে বলছি।” মুজাহিদরা ঝর্ণা তালাশ করে ডিবায় পানি ভরে আনলে আলী তার ব্যাগ থেকে বৈদ্যুতিক তার, ব্যাটারী ও কমেন্টি লোহার পাত বের করে। তার পর লোহার পাতের সাথে তারের এক মাথা লাগিয়ে তা ব্যাটারীর সাথে সংযুক্ত করে। এবার তারের অন্য মাথা রকেট মিজাইলের সাথে টেপ দিয়ে এঁটে দেয়। লোহার পাত একটি কাঠের টুকরার সাথে বেঁধে টিনের পানির উপর ভাসায়। ব্যাটারীর অপর পাশ থেকে অন্য তার এনে টিনের সাথে এঁটে দেয়। এভাবে সে নিজ বুদ্ধিতে একটি টাইম বোমা বানিয়ে ফেলে। এইভাবে একশ গজ দূরে দূরে এক

একটি মিজাইল তাক করে টিনের ডিবায় বিভিন্ন আকারের একটি করে ছিদ্র করে। ছিদ্র থেকে ফোটা ফোটা পানি ঝরতে থাকে। সে সাথীদের নিয়ে এবার দ্রুত শাশের দিকে চলে আসে। শাশের কাছা কাছি এসে একটি নিরাপদ স্থানে স্বাইকে নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

আলীর চিন্তা-চেতনা তাক করা রকেট মিজাইলের দিকে নিবন্ধ। আধ ঘন্টা হয়ে যায়। তার হৃদ কম্পন দ্রুত থেকে দ্রুতভর হয় এই চিন্তায় যে, প্রোথাম বিফল হলে কমাণ্ডারকে কি জবাব দিবে। এটাই হয়ে উঠলো তার উৎকর্ষের বড় কারণ। তার হিসাব মত এতক্ষণে ফায়ার শুরু হওয়ার কথা। এর পরও দশ মিনিট অতিবাহিত হয়। তার চেহারার উপর হতাশার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। সাথী মুজাহিদরাও তাকে ঠাট্টা করতে থাকে। আলী মনে মনে আল্লাহকে ডাকতে লাগলো। কোনক্রমে যদি ইজ্জত রক্ষ পায়। এর পরই হঠাৎ করে একটি মিজাইল ফায়ার হল, তার সাথে সাথে আরও একটি। রশি সৈন্যরা মনে করলো, মুজাহিদরা এদিক থেকে হামলা করছে। তাই তারা সেই দিকে লক্ষ করে ফায়ার খুলে দিল।

এবার আলী সাথীদের বল্লো, দুশ্মনের দৃষ্টি এখন ঐদিকে। আর এখন বিরতি দিয়ে একটি একটি মিজাইল ফায়ার হতে থাকবে। আমরা এই বিরতির সময় শাশের দিকে অগ্রসর হব। মাইনের দিকে সজ্ঞাগ দৃষ্টি রেখে মুজাহিদরা পায়ে পায়ে শাশের কাছে পৌছে যায়। ইতিমধ্যে আটটি মিজাইলের ফায়ার হয়েছে, বাকী চারটা শেষ হবার পূর্বেই মুজাহিদরা লাশ নিয়ে নিরাপদ স্থানে ফিরে আসে। দুশ্মন ধোকায় পড়ে যায়, যে দিক থেকে মিজাইল ফায়ার হচ্ছিল ওদিক দিয়ে তাদের রশদ সরবরার পাইন। সরবরাহ সাইন বল হলে খাদ্য পানি জুটবে না তেবে সৈন্যরা ওই দিকে বেহিসাবী গোলা বারুদ ছুড়তে থাকে।

আলীর মিশন কামিয়াব হওয়ায় কমাণ্ডার সহ সকল মুজাহিদ অত্যন্ত খুশী হয়। তারা একে অন্যকে মোবারকবাদ জানায়। কমাণ্ডার আলীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কি ভাবে এ পরিকল্পনার কথা তোমার মাথায় আসে?” আলী জবাবে বল্লো, “টেনিং নেওয়ার সময় টাইম পীচ ঘড়ির বদলে টিনের ডিবায় পানি রেখে সংযোগ ঘটানোর বিষয়ে পরীক্ষা করে ছিলাম। কিন্তু তখন সফল হইনি। তারপর অনেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই পদ্ধতি আবিষ্কারে সফল হই। টিনের ডিবায় পানি রেখে কাঠের সাহায্যে লোহার পাত ভাসিয়ে রাখি। এর পর প্রত্যেকটি কৌটায় ছোট বড় আকারের ছিদ্র করে দেই। ছিদ্রের আকার অনুযায়ী সময়ের মধ্যে পানি পড়ে গেলে লোহার পাত টিনের গা স্পর্শ করার সাথে সাথে বিদ্যুতের নেগেচিভ পজিচিভ মিলে যায়। তখনই রকেট উড়ে যেয়ে নির্দিষ্ট স্থানে বিফোরিত হয়।

কমাণ্ডার সাহেব আলীর এই কৌশল খুব পছন্দ করেন। সেই রাতে আলীর সাথে পরামর্শ করে পোষ্টের উপর নতুনভাবে আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

তিনি বল্লো, “যত তাড়াতাড়ি সম্ভব

পোষ্টের উপর হামলা করতে হবে। দেরী  
হলে রুশদের শুণ্ঠচরারা এ তথ্য সংগ্রহ করে  
ওদের জানিয়ে দিতে পারে।"

রকেট মীজাইলে, আলীর তৈরি টাইম  
বোমা সংযুক্ত করে মুজাহিদরা পূর্বের মত  
পোষ্টের অন্য পাশে এসে অবস্থান নেয়।  
আলী সবার আগে যেয়ে পোষ্টের সৈন্যদের  
গতিবিধির উপর সজাগ দৃষ্টি রাখতে থাকে।  
মিজাইল বিক্ষেপনের আওয়াজ শুনেই রুশ  
সৈন্যরা সেই দিকে অবিরাম গোলা বর্ষণ  
করতে থাকে।

রুশ সৈন্যরা আর্টিলারী অস্ত্রের উপর পূর্ণ  
তরসা করতে না পেরে ওয়ারলেসে হেড  
কোয়ার্টার থেকে বিমান পাঠাতে বলে। এক  
বৌক বোমার বিমান এসে তাদের কথামত  
প্রচুর বোমা ফেললো। আর মোজাহিদরা  
অপর পাশের মরিচায় দাঢ়িয়ে দাঢ়িয়ে তা  
উপভোগ করতে ছিলো। দুশ্মনদের গতিবিধি  
নিরীক্ষা করার পর আলী অপর পার্শ থেকে

হামলা করার নির্দেশ দেয়। আর সাথে সাথে  
সকল মুজাহিদরা এক ঘোগে পোষ্টের উপর  
ঝাপিয়ে পড়ে। এই ঝাঁঠিকা আক্রমণে  
সরকারী সৈন্যরা হতবুদ্ধ হয়ে যায়। তারা  
বুবে উঠতে পারছিল না, কি করবে। কোন  
দিকের আক্রমণ আগে ঠেকাবে। কিছু কিছু  
সৈন্য দিগ-বিদ্বি হারিয়ে নিজেদের বিছানো  
মাইনের উপর যেয়ে হমড়ি খেয়ে পড়ে।  
মুজাহিদদের শুলি ও হ্যান্ড গ্রেনেডে বেশ  
কিছু সৈন্য হতাহত হয়। বেঁচে যাওয়া বাকী  
বিশজ্ঞ আতাসমর্পণ করে। মুজাহিদরা  
তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে।

এই যুদ্ধে প্রচুর রক্ষী অস্ত্র মুজাহিদরা  
গৰ্বীমত হিসেবে লাভ করে। খাদ্য দ্রব্য যা  
পেয়েছে তাতে মাকাজের এক মাসের  
প্রয়োজন ছিটে যায়। বিজয়ের পর  
ডিনামাইটের বিক্ষেপণ ঘটিয়ে মুজাহিদরা  
রুশদের পাকা মরিচা গুলো গুড়িয়ে দেয়।  
যদিও লড়াইয়ে ডিনাম মুজাহিদ শহীদ ও  
সক্ষম হই।

পনেরোজন যখনী হয়। কিছু বিজয়ের  
উল্লাসের তুফানে সে বেদনা চাপা পড়ে  
থাকে।

পোষ্টটি বিজয়ের পর মুজাহিদরা এক  
আনন্দ উৎসবের আয়োজন করে। কমাঙ্গোর  
আলীকে মোবারক বাদ জানিয়ে বলে,  
"আমরা তোমাকে ছেট তেবে কোন  
গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত করার সাহস  
পাছিলাম না। তুমি বয়সে ছেট হলে কি  
হবে, আল্লাহ তোমাকে সাহস-হিস্ত ও  
তার সাথে সাথে আক্ষল ও হেক্মত দান  
করেছেন। আজ থেকে তুমি এই মারকাজে  
আমার নায়বের দায়িত্ব পালন করবে। আমি  
চীপ কমাঙ্গোরের নিকট সুপারিশ করব, তিনি  
যেন তোমাকে মজলিশে সুরার সদস্য বানিয়ে  
নেন, যাতে তোমার সুপরামর্শ দ্বারা নতুন  
নতুন যুদ্ধ কৌশল উত্পাদন করা যায় এবং  
আমরা প্রতিটি অপারেশনে বিজয় লাভে  
সক্ষম হই।

**সুসংবাদ!**

**সুসংবাদ!!**

**সুসংবাদ!!!**

রেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড) এর পক্ষ হতে ইসলামী আদর্শ  
মূল্যবোধের ভিত্তিতে বেফাকের প্রাইমারীর সকল বিষয়ের বই পৃষ্ঠক প্রনয়ন ও প্রকাশ করার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ  
গ্রহণ করা হয়েছে এবং শীঘ্ৰই কওমী পাবলিকেশন্স এর মাধ্যমে উহা প্রকাশ ও বাজারজাত করা হচ্ছে—ইনশাল্লাহ।

অতএব সকল কওমী মাদ্রাসায় অত্র বই পৃষ্ঠক সমূহ পাঠ্য করার জন্য এবং অন্যান্য বই পাঠ্য না করার জন্য  
বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(মাওলানা) আবদুল জবার  
সাধারণ সম্পাদক

**বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া**

বিঃ দ্রঃ সার্বিক যোগাযোগঃ কওমী পাবলিকেশন্স  
১৫৪, মতিঝিল বাণিজ্যিক, এলাকা, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশ।

### কবর

মুঃ আঃ গনি খান

সাথীহীন কবর আমায় ডাক দিয়েছে তাই  
তয়ে কেবল কাঁপছে বুক উপায় তো আর নাই।  
মাটি চিরে মূন্কার নাকির আসবে আমার কাছে  
বাক শক্তি চলে যাছে বলার কি মোর আছে?  
দীন কি তোমার, রাসূল কেবা, প্রভু তোমার কে?  
নেকী জন তো উত্তর দিবে অতি সহজে।  
করব হবে তাহার কাছে জানাতের বাগান  
অন্যায়সে করবে সেথা অমীয় সুধা গান।  
কোনই কষ্ট না রাখিবে কবরে তাহার  
মায়ের কোলে ঘুমায় যেমন কতই শান্তি তার।  
কিন্তু জবাব না পারিলে কেমন দশা হবে  
দুনিয়ার পাপের ফল ভুগতে সেথায় রাবে।  
যতই দর্প করছো বাল্দা ধরার বুকে থেকে  
প্রতিশোধ লইবে মাটি আপন বক্ষে রেখে।  
দু'পাশ হতে মাটি এসে দিবে এমন চাপ  
হাত্তি হবে গুড়ো গুড়ো বুবাবে তখন বাপ।  
ফেরেশতারা মারবে যখন গুরুজের বারী  
মুণ্ড হবে ছিন ডিম ছিড়বে নাড়ি ভুড়ি।  
আগুনের হলকা এসে করবে শরীর দাহো  
কোন সাহসে পাপ কর্ম করছো অহরহ।  
সাপ বিচ্ছুর দংশনেতে পাবে কতই জ্বালা  
অবৈধ মাল সর্প হয়ে হবে কষ্ট মাল।  
দোজখের টুকরো হবে কবরটি তাহার  
শরীর খানা হবে তাহার সাপ বিচ্ছুর আহার।  
এসব কথা ঘৰণ করে দেখছো কঙ্ক ভাট  
তাইতো বলি পাপ কার্য্য ছেড়ে দেয়া চাই।  
কবর মাঝে সব মানুষের যেতে হবে তাই  
এসো তবে সবাই মোরা ভালো হয়ে যাই।  
আস্তাহ পাকের শুভ দৃষ্টি তথায় যেন পাই  
তাহা হলে মনে আমার কোনই চিন্তা নাই।

### জিঙ্গাসা

আবুল হাসানাত খান

আচ্ছা আপা বলতে পারো  
মানুষ কেন এত বোকা?  
অঞ্জিমের এই দুমিয়ায়

থাছে কেন শুধুই খোকা?  
রূপ লাবন্য এই চেহারা  
থাকবে মোদের কিছু?  
তবে কেন ঘুরছি মোরা  
শয়তানেরই পিছু।  
কুরআনেতে দিয়েছেন খোদা  
তোদের কতইনা সমান  
না বুঝিয়া করছো তোমরা  
কেন অভিমান?  
আচ্ছা আপা বলতো দেখি  
শান্তি কোথায় আছে?  
যিনি করছেন পয়দা মোদের  
শান্তি তাহার কাছে।  
তবে কেন ঘুরছি মোরা  
অবুজ পাখির মত।  
যত ঘুরি পর্দা বিহীন  
দুঃখ বাড়ে তত।  
সুখের সাথে কটিবে জীবন  
এই যদি হয় আসা  
নেককারদের সাথে মোদের  
বীধতে হবে বাসা।

### ঈমানী মশাল

কাজী হায়াত মাহমুদ

জাগো মুজাহিদ ছাড়ো ছাড়ো নিদ  
উঠে পড়ো তাড়াতাড়ি  
সময় নেইতো চলো একসাথে  
জেহাদের পথ ধরি।  
দিকে দিকে আজ পায়ও আওয়াজ  
পৃথিবীর চারি ধারে।  
তামাম বেদীন মুসলিম নিধনে  
লেগে গেছে উঠে পড়ে।  
করে মোকাবেলা এ নিঠুর খেলা  
নারায়ে তাক্বীর বলো।  
সাজাও কাফেলা এখনি এ বেলা  
তৌহিদী পতাকা তুলো।  
সমুখে আঁধার হতে হবে পার  
ঈমানী মশাল জ্বেলো।  
ওগো মুসলমান হও আগুয়ান  
ভুলেরে পিছনে ফেলো।

# পর্মণুর

● জি, এম, মাহমুদুর রহমান  
একাদশ বাণিজ্য, ১ম বর্ষ  
ইশ্বরদী সরকারী মহাবিদ্যালয়।

প্রশ্নঃ (ক) যাদের ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয় এমন কয়েকজন  
বাকি মিলে যদি নিজেরা চাঁদা দিয়ে বা অন্য কারও থেকে  
টাকা নিয়ে এক নামে কুরবানী করে তবে তা জায়েয় হবে কি?  
(খ) কুরবানীর জানোয়ারের গলায় যে লাল ফিতা বা মালা  
পরান হয় তা কি কুরআনে বর্ণিত 'কালাদাহ' হিসেবে চিহ্নিত  
হবে? যদি না হয় তবে কুরবানীর জানোয়ারের গলায় মালা  
পরানোকে শরীয়তের দৃষ্টিতে কি বলা হবে?

উত্তরঃ (ক) হাঁ জায়েয় আছে।

(খ) সাধারণত আমাদের দেশে কুরবানীর জানোয়ারের  
গলায় যে মালা পরান হয় তা "কালাদাহ"-এর ব্যাখ্যা ও  
সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। জাহেলীযুগে পবিত্র কাবায় কুরবানীর  
জন্য প্রেরিত পশুর গলায় চিহ্ন স্বরূপ কিছু ঝুলানোর যে রীতি  
ছিলো তাকে 'কালাদাহ' বলা হয়। পরবর্তি সময়ে ইসলামে এই  
'কালাদাহ'কে হারাম করা হয়েছে। যদিও কুরবানীর পশুর  
গলায় মালা ঝুলান হারাম ঘোষিত 'কালাদাহ'-এর অন্তর্ভুক্ত  
নয় তবুও এটা শরীয়ত অনুমোদিত কোন রীতি নয়।

মালা, রঙিন কাপড় ও ফুল দ্বারা সজ্জিত বিধৰ্মীদের পশু  
বলিদান ও জাহিলী রীতির সাথে এর সাদৃশ্য বিদ্যমান।  
বিধৰ্মীদের প্রচলিত সব ধরণের রীতি মুসলমানদের জন্য বর্জনীয়  
বিধায় কুরবানীর পশুর গলায় মালা পরান থেকে বিরত থাকা  
চাই। কোন কোন বিষয় দৃশ্যত ছোট মনে হলেও তা ইসলামী  
মূল্যবোধ, রীতি নীতি ও কৃষ্ণ সংস্কৃতির বিচারে মোটেই ছোট  
নয়। মুসলমানদের সব সময় নিজস্ব-স্বাতন্ত্র সত্তা বজায় রাখা  
অপরিহার্য। যে কোন বিষয়ের মূল থেকে তার আনুসংগিক সব  
ব্যাপার ইসলাম ও শরীয়তের আলোকে সম্পন্ন করা চাই। যাকে  
ঈমানের দাবী বলা হয়। যা কোন ঈমানদারের পক্ষে এড়িয়ে  
যাওয়া বা উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

● মোঃ আলমগীর হোসেন (রেহমুনাম)

প্রয়ত্নঃ সাইফুর রহমান (মঞ্জু)

ধাপ, শ্যামলী লেন, রংপুর-৫৪০০।

প্রশ্নঃ 'জাগো মুজাহিদ'-এর গত মার্চ এপ্রিল সংখ্যায় দেখতে

পেলাম, মানুষের শরীরের কোন অংগ দান বা বিক্রি করা বৈধ  
নয়। কিন্তু কিছু দিন পূর্বে আমি রংপুর সঞ্চানী সংঘের উদ্যোগে  
রাঙ্গদান করেছি। বঙ্গদের পাল্লায় পড়ে এমন কাজ অজানা ও  
অনিষ্টাকৃতভাবে করার জন্য আমার পাপ হবে কি?

উত্তরঃ টাকার বিনিময়ে অথবা বিনিময় ছাড়া রাঙ্গ দান  
করা বাহ্যত মহৎ কাজ মনে হলেও এটা স্পষ্ট অনধিকার  
চর্চা। কেননা আপনার শরীরের কোন অংশেরই আপনি মালিক  
নন। এই পৃথিবীতে আপনি নিজ ইচ্ছায় আসেননি। জন্ম এবং  
মৃত্যু কোনটাই আপনার আমার ইচ্ছাধীন নয়। অর্থাৎ আপনি  
স্বাধীন নন। যা ইচ্ছা তা করার অধিকার আপনার নেই। আপনি  
আমি যেটাকে মহৎ, কল্যাণ ও পূর্ণ মনে করব তা পূর্ণ নয়।  
মহৎ নয়। শরীয়তের নির্দারিত সীমানার মধ্যে সীমিত  
আমাদের পদচারণা। এর অনুসরণের মধ্যে নিহিত আমাদের পর  
ও ইহ জাগতিক মুক্তি ও কল্যাণ। এ পর্যন্ত কোন গবেষক-  
বিজ্ঞানী ইসলামের সামান্য একটি বিষয়কেও অবাঞ্ছিত প্রমাণ  
করতে পারেনি। মহৎ কাজ করলাম ঠিক কিন্তু এর দ্বারা যে  
অনধিকার চর্চা করলাম তার সমাধান কি? তবে রাঙ্গের জন্য  
কারও জীবন-মরণ সমস্যা দেখা দিলে তখন রাঙ্গ দিয়ে তার  
জীবন রক্ষা করা জায়িয় বলে বর্তমান মুফতীগণের অভিমত।

ভুলে বা অনিষ্টাকৃতভাবে কোন খারাপ বা পাপ কাজ করে  
ফেল্টে তা আল্লাহু ক্ষমা করে দিবেন বলে আশা রাখি। ভুলের  
জন্য সংশোধন ও তওবা ছাড়া ইতীয় কোন পথ আছে কি?

● মোঃ দীন ইসলাম  
দারুল্ল উলুম দেওতোগ  
নারায়ণগঞ্জ।

প্রশ্নঃ ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা জায়িয় কি? ধর্ম নিয়ে রাজনীতি  
করা চলবে না এটা কার কথা? মসজিদের মধ্যে কোন ধরণের  
রাজনৈতিক কথা বলা জায়িয় কি?

উত্তরঃ অন্য কোন ধর্মে রাজনীতি আছে কি না জানি না।  
তবে ইসলামে আলাদা সমাজে ও রাষ্ট্র নীতির কথা বলা  
হয়েছে। সেমতে রাজনীতি ইসলামের একটি শুরুত্বপূর্ণ শাখা।  
রাসূল (সা):— এর শেষ জীবনের শুরুত্বপূর্ণ সময়গুলো কেটেছে  
রাজনৈতিক ময়দানে, সমাজে শাস্তি শৃঙ্খলা আনয়ন, আইন ও  
ইনসাফ কায়িম এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। রাজনীতি ছাড়া  
ইসলামকে বক্সনা করা যায় না। এর এক নবর কারণ হলো,  
আলাদা ইসলামী দেশ ব্যাপ্তি ইসলামের বিচার ও অর্থনৈতিক  
ব্যবস্থা মোটেই কার্যকরী করা যায় না। আমাদের সুযোগ্য  
উত্তরসূরীগণ শত প্রতিকূল অবস্থায়ও সবসময় রাজনৈতিক  
ময়দানে সক্রিয় ছিলেন।

যারা ইসলামকে বুঝে না বা সহ্য করতে পারে না তারাই  
বলে, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা চলবে না।

নাস্তিক ম্যাকিয়ালভী প্রথম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এর মন্ত্র

আবিক্ষার করে। যার অর্থ করা হয় ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি করা চলবে না বলে। অন্য কোন ধর্মের বেলায় এর বাস্তবতা কতখানি তা সংশ্লিষ্ট ধর্মের 'অনুসারীরাই' বলবেন। আমরা আচর্য হই তখন যখন কেউ ইসলামকে লক্ষ করে এইরূপ দাবী নিষ্কেপ করে। ইসলামে এইরূপ দাবী গ্রহণ করার অবকাশ তো নেই—ই বৰং পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইন দ্বারা বিচার করে তারা কাফির ও জালিম। উপরন্তু আমরা সকল মানুষের নিকট অত্যন্ত দরদের সাথে সাম্য, শান্তি, ন্যায় বিচার, অর্থনৈতিক মুক্তি ও সুন্দর ভবিষ্যতের লক্ষে বিশ্বময় ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জাপিয়ে পড়ার আহবান জানাই।

ইসলামী কর্মকাণ্ড পরিচালনার কেন্দ্র ও শাখা কেন্দ্র হলো মসজিদসমূহ। রাসূল (সাঃ) মসজিদে নামায আদায় ছাড়াও বহু রাজনৈতিক ভাষণ ও বিচার করেছেন মসজিদের মধ্যে বসেই। অতএব মসজিদে ইসলামী রাজনৈতিক কথা বলা যাবে না এমন কথা অবাস্তব। হ্যাঁ তবে ইসলাম বিরোধী ও ইসলাম অনন্মোদিত কথা বার্তা মসজিদে বলা হারাম।

● মোঃ তৈয়ব আল হোছাইনী

দারুল উলুম দেওতোগ

নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

প্রশ্নঃ ইসলামের দৃষ্টিতে কাউকে ফুলের মালা দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা, বরণ করা বা সম্মানীত করা বৈধ কি? যদি বৈধ না হয় তবে এসব কাদের প্রথা?

উত্তরঃ মুসলিমদের নিকট ফুলের মূল্য এতটুকু যে, এটা আল্লাহর একটি সৃষ্টি এর চেয়ে বেশী নয়। কখনও এর মূল্য এত বেশী নয় যে, এর দ্বারা সৃষ্টির সেরা জীব মানুষকে সম্মানীত করা যায়। কবিরা হয়ত ফুলকে স্বর্ণের খণ্ডিত অংশরূপে কল্পনা করতে পারে, তালাবাসার প্রতীক বানাতে পারে, হিন্দুরা পূজার অর্ঘ বানাতে পারে কিন্তু শরীয়াত বা ইসলামের পরিমঙ্গলে এর গুরুত্ব কি?

হ্যাঁ, তবে হিন্দুদের নিকট এর গুরুত্ব অপরিসীম। ফুল তাদের নিকট পবিত্রার প্রতীক। পূজার মূর্তীর গলায় মালা ও পদদেশে অর্ঘ নিবেদনে তাদের ফুল না হলে চলে না। ফুলের মালা দিয়ে সম্মানীত করা বা ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে বউ বরণ করা হিন্দুদের সাংস্কৃতি। এসব মুসলিম সামজের রেওয়াজ নয়। এসব যারা করে তারা কত বড় পাপ করে তা জানি না, তবে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যারা অন্য ধর্মের লোকের আচার আচরণ গ্রহণ করে তারা আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয়।

● এইচ, এম, আশফাক

গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

প্রশ্নঃ (ক) বাংলাদেশের সর্বত্র সন্ন্যাস, অশান্তি ও নৈরাজ্য বিদ্যমান। এর কারণ ও প্রতিকার কি? সমাজ থেকে এসব মূল

থেকে দূর করা সম্ভব কি?

(খ) কেউ যদি শিয়া সম্প্রদায়ের নীতি অনুসরণ করে তবে তাকে কি বলা হবে? শিয়াদের আকিদা বিশ্বাস সম্বন্ধে বিস্তারিতজ্ঞানাবেন।

উত্তরঃ হী সম্ভব। সত্যের স্বার্থে আপোষহীন ইসলাম তার অনুপম আদর্শ ও ইনসাফ দ্বারা জাহেলী যুগের অসভ্য, অশিক্ষিত, প্রতিশোধ পরায়ন ও পৌত্রলিকতায় বিশ্বাসী যেসব মানুষকে আপন ছায়ায় টেনে নিয়ে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত করেছে সে ইসলাম, সে কুরআন-হাদীস এখনও আছে। আমরা সবাই মিলে এর আলোকে সেই সোনালী ইতিহাসের অনুকরণে যদি এই দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে কুরআন হাদীসের আলোকে জীবন গড়ি ও চলি তাহলে সমাজ থেকে সন্ত্রাস, অশান্তি ও নৈরাজ্য তাড়াতে মিটিং করতে হবে না, সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য নতুন আইন তৈরী করতে হবে না। এমনিই সব দূর হয়ে যাবে। ইসলামই কেবল এর প্রতিকারের শক্তি রাখে। খাঁটি মুসলিমানরা সব সময় এসব থেকে দূরে থাকে। এ কারণেই পাঁচাত্তের দেশগুলোর চেয়ে মুসলিম দেশগুলোতে অপরাধ কম। আর যদি মুসলিম দেশগুলোতে পূর্ণরূপে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকত এবং যদি শাসন ক্ষমতা দ্বিন্দার লোকদের হাতে থাকত তাহলে ইসলামের কঠোর বিচার ব্যবস্থার ভয়ে হলেও অপরাধীরা দমে যেত অথবা দেশ থেকে পালিয়ে যেত। যতদিনে আমরা আমাদের দেশে ইসলাম কার্যমের সংগ্রামে সফল না হব ততনিদ অন্যায়ের কবলে নিপত্তি হতে থাকব। তাই আসুন, সময় নষ্ট না করে দেশ, জাতি ও পরকালের স্বার্থে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ি। এটাই সারিক মুক্তির একমাত্র বিকল্পহীন পথ।

(খ) শিয়াদের নীতি বলতে আপনি কি বুঝতে চাচ্ছেন তা স্পষ্ট নয়। তবে সর্বসম্মতভাবে শিয়া একটি ভ্রান্ত মতবাদ। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য 'জাগো মুজাহিদ' মে ৯৩ সংখ্যার প্রশ্নাঙ্কের দেখুন। নীতিগতভাবে শিয়ারা আপোষহীন ও জেনী ধর্মবিশ্বাসে দৃঢ় ও আস্থাশীল। নিজস্ব যুগ-ইমামের নির্দেশে তারা কুরবানী হতে প্রস্তুত। আহলে সন্ন্যাত ওয়াল জামাতের আকিদায় বিশ্বাসী মুসলিমানদেরকেও তারা প্রতিপক্ষ হিসেবে মনে করে। মোতা, তাজিয়া, তাকিয়াসহ নোৎো কিছু আচরণ অভ্যাসে তারা অভ্যন্ত। এসবকে তারা ধর্মের অংশ মনে করে। যা মূলত পাপ ও গর্হিত কাজ। আল্লাহ আমাদের সকলকে সহীহ বুঝ ও হেদায়েত দান করেন।

● মোঃ মাসুদুর রহমান

ঈশ্বরদী সিদ্দীকিয়া কওমিয়া মাদ্রাসা

পোঃ ঈশ্বরদী, পাবনা।

প্রশ্নঃ মিলাদ পড়া শরীয়ত সমর্থিত কাজ না বেদয়াত, সঠিক উত্তরদানেবাধিতকরণ।

**উত্তরঃ** মিলাদ অর্থ জন্ম, জন্ম তারিখ বা সন। মিলাদুন্নবী দ্বারা রাসূল (সা:)—এর জন্মগ্রহণ দিবসকে বুঝায়। প্রচলিত দরদ পাঠ অনুষ্ঠানকে মিলাদ হ্যত এই অর্থে বলা হয় যে, সবাই মিলে এক সাথে দরদ পাঠের পূর্বে আরবীতে রাসূল (সা:)—এর অতিসংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করা হয়। যা সাধারণ লোকেরা বোঝেনই না যে কি বলা হচ্ছে। মিলাদ নামে এই প্রকারের কোন অনুষ্ঠানের কথা কুরআন, হাদীস, ফেকাহ ও আদর্শ যুগের গ্রহণযোগ্য কোন ইতিহাসের গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অনুষ্ঠানটি একেবারে নতুন যা বিগত খুবই নিকট ইতিহাসের কথা। এই রূপ কোন অনুষ্ঠান ঈমামদের যুগে তো ছিলই না এবং বর্তমান বিশ্বের নির্ভরযোগ্য মুফতী ও আলিমগণও এর পক্ষে নয়। তারা একে বেদায়াত বলেন। কেবল ভারতীয় উপমহাদেশের এক শ্রেণীর মুসলমানকে এর চর্চায় খুবই অন্তরিক বলে মনে হয়।

বস্তুত, ইবাদাত মনে করে আমরা যা করব সে বিষয়টি ইবাদাত হওয়ার পক্ষে কুরআন হাদীসের সমর্থন থাকা অপরিহার্য। ইচ্ছামত কোন বিষয়কে ইবাদাত বানিয়ে তা পালন করে সাওয়াবের আশা করা অবাস্তৱ। তাই সব রমক ইবাদাতের ব্যাপারে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। আমার প্রত্যেকটি আমল গ্রহণযোগ্য, নিখুঁত ও নির্ভুল হওয়া চাই। যে আমল ইবাদাত নয় তা ইবাদাত মনেকরা যেমন পাপ তেমনি তা পালনে সময়, শক্তি ও অর্থ ব্যয় করার পিছনে কোন যৌক্তিকতা নেই। সব ধরণের বেদাআতের বেলায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা চাই। বেদাআত সব সময় মানুষকে ভুল পথে ঢালায়। পরিণামে ঈমান হারা হয়। বর্তমান সময়ের এক শ্রেণীর চিহ্নিত বেদাআতীরা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

#### ● নাসরীন সুলতানা (জনি)

রাজ্ঞামাটি সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়  
নমব শ্রেণী 'ক' শাখা।

**প্রশ্নঃ** (ক) আমরা বড়দের মুখে লাইলি-মজনুর যে ঘটনা শুনি তাকি সত্য? কুরআন-হাদীসে এ ঘটনার কথা উল্লেখিত হয়েছে কি? এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য জানতে চাই।

(খ) আমি কুরআন হাদীস পড়তে ও বুঝতে চাই। এ সবকে কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগযোগ করলে ভালো হয় সে ব্যাপারে পরামর্শ চাই।

**উত্তরঃ** (ক) কুরআন হাদীসে তো নয়ই ইতিহাসের কোন গ্রন্থেও এ ঘটনার সত্যতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। এরা কোন কবি বা উপন্যাসিকের কল্পনার প্রেমিক-প্রেমিকা বলে আমদের ধারণা। যদি এই ঘটনা বাস্তব হয়েও থাকে তবে তা ইতিহাস লেখার পূর্বের কথা।

(খ) কুরআন হাদীস জানতে ও বুঝতে হলে আপনাকে যে কোন মহিলা মাদ্রাসায় ভর্তি হতে হবে। এ জন্য আপনি ১২নং মিরপুরের জামেয়া মিল্লিয়া মহিলা মাদ্রাসায় যোগাযোগ করতে পারেন। চট্টগ্রামেও একাধিক মহিলা মাদ্রাসা আছে বলে জানি। আপনি আগ্রহী হয়ে সংবাদ নিলে সঠিক তথ্য পাবেন।

● মোঃ মাহবুব রহমান (ত্রুটি)  
চরমোনাই কওমিয়া মাদ্রাসা  
বরিশাল।

**প্রশ্নঃ** (ক) অনেকে বলে, চিংড়ি মাছ খাওয়া মাকরহ। তাদের যুক্তি হলো, চিংড়ি মাছের রক্ত নেই তাই তা খাওয়া জারিয়ে নয়। এছাড়া পানির মধ্যে কোন কোন প্রাণী খাওয়া বৈধ বুঝিয়ে বল্লে উপকৃত হব।

(খ) আমি যখন নামাযে দাঢ়াই তখন বিভিন্ন দিকে মন ছুটে যায়। কেন যেন মন হির থাকে না। নামাযের মধ্যে মন হির রাখার উপায় কি পরামর্শ চাই।

**উত্তরঃ** (ক) যারা চিংড়ি মাছ খাওয়া মাকরহ বলে তাদের কথা ঠিক নয়। ফিকাহবিদদের মতে শুধু চিংড়ি মাছ কেন কোন মাছের শরীরেই রক্ত নেই। পানির মধ্যে যেসব প্রাণীকে মৎসজীবীরা মাছ বলে আখ্যায়িত করে সেইসব প্রাণী খাওয়া যায়—সেই সবকেই মাছ বলা হয়। মৎসজীবীরা যাকে মাছ বলে না তা খাওয়া বৈধ নয়—তা মাছও নয়। মৎসজীবীরা যেহেতু চিংড়িকে মাছ বলে এবং মুসলমানদের নিটক যেহেতু চিংড়ি খাদ্য তালিকা ভুক্ত সেহেতু এ ব্যাপারে দ্বিতীয় কোন মতের অবকাশ নেই।

(খ) নামাযের মধ্যে মনকে হির রাখার উপায় হলো, আমি নামাযে যা যা পড়ব সেদিকে গভীর লক্ষ রাখা, মনযোগের সাথে কেরাতসহ দোয়া দরবদ পাঠ করা। নামাযের শুরু থেকে এই ধারণা করা যে, আল্লাহ আমার সামনে আছেন, তিনি আমাকে দেখছেন, তারই সামনে দাড়িয়ে আমি নামায পড়ছি ইত্যাদি। এতে নামাযের মধ্যে একগ্রাতা সৃষ্টি হয়। তবে নামাযের মধ্যে মন এদিক সেদিক ছুটে গেলে এমন ধারণাকরা ঠিক নয় যে নামায হয়নি। এতে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না। তবে নামাযের ওয়ন যে কমে যায় তা নিসন্দেহে বলা যায়।

● হাঃ মোঃ মনিরজ্জামান (মনির)  
যাকারিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা  
সেনহাটি, দিঘিলিয়া  
দৌলতপুর, খুলনা।

**প্রশ্নঃ** (ক) মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলীফা হয়রত উসমান

(ରାୟ)-କେ କାରା ଶହୀଦ କରେ? କି ଜନ୍ୟ ଶହୀଦ କରେ ଏବଂ କିଭାବେ ଶହୀଦ କରେ, ବିଷାରିତ ଜାନତେ ଚାଇଁ।

(୩) ଜଙ୍ଗେ ଛିଫିନ କତ ହିଜରୀତେ ସଂଘାଟିତ ହୟ ଏବଂ କେନେ ଏହି ଜଙ୍ଗେ ଛିଫିନ ସଂଘାଟିତ ହୟ, ଜାନାଲେ ଉପକୃତ ହବ।

ଉତ୍ତରଃ (କ) ମୁସଲିମ ଜାହାନେର ତୃତୀୟ ଖଲීଫା ହୟରତ ଉସମାନ (ରାୟ)-ଏର ଶହୀଦ ହେତୁର ଘଟନାର ଜନ୍ୟ ଇହନୀ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ ଇବନେ ସାବାର ପ୍ରରୋଚଣାୟ ବିଭାସ୍ତ କିଛୁ ସଂଖ୍ୟକ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଦାୟୀ।

ଇଯାମେନେର ଅଧିବାସୀ ଏହି ଇହନୀ ଇବନେ ସାବା ମୁସଲିମ ଉସାହର ଏକକ୍ୟକେ ବିନଟକରଣ ଓ ମୁସଲିମ ସମାଜେ ବିବାଦ, ରଙ୍ଗପାତ ସୃଷ୍ଟିର ଜନ୍ୟ ତୃତୀୟ ଖଲීଫାର ଶାସନାମଲେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତାର ଧର୍ମଗ୍ରହଣେର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଛିଲ ମୁସଲିମ ସମାଜେର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଠାଇ ନିୟେ ମୁସଲିମ ଐକ୍ୟର ଓପର ଚରମ ଆୟାତ ହାନା। ସେ ଖୃଷ୍ଟଧର୍ମ ବିକୃତିକାରୀ ଓ କ୍ଷରସକାରୀ ସୋଲାସେର ଅର୍ଜିତ ସାଫଲ୍ୟକେ ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନା କରେ ମୁସଲିମ ଜଗତେର ପ୍ରିୟତମ ଓ ସୁଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଗଣେର ସମ୍ପର୍କେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ଓ ଅତିରଙ୍ଗନେର ପହା ଅବଲମ୍ବନ କରେ। ମୁସଲମାନଦେର ବିଭାସ୍ତ କରାର ପଥ ବେଛେ ନେୟ। ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସେ ହେଜାଜକେ ବେଛେ ନେୟ। କିନ୍ତୁ ସେଥାନେ ଇସଲାମେର ବାଘା ବାଘା ରକ୍ଷକ ଥାକାଯ ସେଥାନ ଥେକେ ବସରାଯ ପୌଛେ। ବସରା ଓ ସିରିଆ ଥେକେଓ ସେ ବିତାଡିତ ହଲେ ଦୂରତମ ଅଞ୍ଚଳ ମିଶି ପୌଛେ। ଏଥାନେ ସେ ପ୍ରଚାର କରତେ ଥାକେ ଯେ, “ରାସ୍ତାମାନୀ (ରାୟ)- ଏର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଈସା (ଆୟ)- ଏର ଚେଯେ ବେଶୀ, ସୁତରାଂ ଈସା (ଆୟ) ପୂନରାୟ ପୃଥିବୀତେ ଆଗମନ କରଲେ ତିନିଓ ପୁନରାୟ ପୃଥିବୀତେ ଆଗମନ କରବେନ। ରାସ୍ତାମାନୀ (ରାୟ)- ଏର ପର ଖଲීଫା, ଇମାମ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରଧାନ ହେତୁର, ଅଧିକାର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ହୟରତ ଆଲୀରଇ ଛିଲ। ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନବୀରଇ ଏକଜନ ଭାରପ୍ରାଣ୍ୟ ହେୟାଇଁ ଏବଂ ଭାରପ୍ରାଣ୍ୟକୁ ନବୀର ପରେ ଉତ୍ସତଗଣେର ପ୍ରଧାନ ହେୟ ଥାକେ। ହୟରତ ଆଲୀ (ରାୟ) ବଂଶେର ଦିକ ଥେକେ ଛିଲେନ ସେଇ ହକେର ଦାୟିଦାର। କିନ୍ତୁ ପରେର ତିନଜନ ଖଲීଫା ଅନ୍ୟାନ୍ୟଭାବେ ତାକେ ସେ ଅଧିକାର ଥେକେ ବନ୍ଧି କରରେଇଁ।”

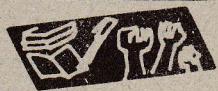
ବ୍ୟାସ, ଇବନେ ସାବାର ଏ ରସାଲୋ ପ୍ରଚାରଣାର ଫଳେ ଅଛି କିଛୁଦିନେର ମଧ୍ୟେଇ ତାର କିଛୁ ସାଗରେଦ ଜୁଟେ ଗେଲା। ଇବନେ ସାବାଓ ଧାପେ ଧାପେ ପ୍ରଚାରଣାର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରତେ ଥାକଲୋ। ସମୟକଦେର ନିୟେ ଏକଟା ଗୁଣ ବାହିନୀ ଗଠନ କରେ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ରେର ଦୂରତମ ସକଳ ଅଞ୍ଚଳେ ତାର ମତବାଦ ପୌଛେ ଦେଇଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରଲା। ମୋଟାମୁଟିଭାବେ, ବସରା, ସିରିଆ, ମିଶର ଓ ପାରସ୍ୟେ ତାର ବେଶ କିଛୁ ସମ୍ରଥକ ଗଡ଼େ ଓଠିଲା। ଇବନେ ସାବା ଏବାର ଆଲୀ (ରାୟ)- ଏର ପ୍ରାତି “ଦେବତା” ଆରୋପ କରେ ସମ୍ରଥକଦେର ଚଢ଼ାନ୍ତ ତାବେ ଅନ୍ତିର ଜାଲେ ନିକ୍ଷେପ କରଲୋ। ବଲା ହଲ, “ଆଲୀ (ରାୟ) ଆହ୍ଵାହର ଓରସଜାତ, ତାର ମର୍ତ୍ତବୀ ନବୀ, ରାସ୍ତାମାନ୍ଦର ଉତ୍ୱର୍ଧେ ଯା” ଆଧୁନିକ

ଖୃଷ୍ଟାନଦେର ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସେର ସାଥେ ପୁରୋପୁରି ସାଦୃଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଏକଇ ସମୟ ଖଲීଫା ହୟରତ ଉସମାନ (ରାୟ)- ଏର ସରଲତା ଓ ଶାସନକାର୍ଯ୍ୟ ଉଦାରତାର ସୁଯୋଗେ ଏକଶ୍ରେଣୀର ମତଲବାଜ ମୁନାଫିକ ସାମାଜ୍ୟେ ବିଶ୍ୱାସ୍ତାନଦେର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସରୋପରି ଖଲීଫା ସଠିକ ଓ ଦ୍ରୁତ ଯୋଗାଯୋଗେର ଅଭାବେ ରାଜ୍ୟର ଦୂରତମ ଅଞ୍ଚଳେ ସୃଷ୍ଟ ଇବନେ ସାବାର ଗୋପନ ଏହି ଭୟକ୍ଷର ସତ୍ୟବ୍ରତର ସଠିକ ସଂଖ୍ୟାଦ ପେଲେନ ନା। ଧୂର୍ତ୍ତ ଇବନେ ସାବା ଏହି ସୁଯୋଗେ ମୁସଲମାନଦେର ମଧ୍ୟେ ଚଢ଼ାନ୍ତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟିର ଜନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଦେର ଉକ୍କାନୀ ଦିଲ, “ସଂ କାଜେର ଆଦେଶ ଓ ଅସଂ କାଜେର ନିମେଧ ଏବଂ ଉତ୍ସତର ମଧ୍ୟେ ସୃଷ୍ଟ ଅନର୍ଥକ, ଭଣ୍ଟତା, ସଂଶୋଧନେର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେଷ୍ଟା କରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁସଲମାନର ଫରଜ। ତାଇ ଉସମାନ ଓ ତାଁର ଗତର୍ଭରଦେର କାରଣେ ଉତ୍ସତର ମଧ୍ୟେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ୍ତା ଓ ଭଣ୍ଟତା ଦେଖା ଦିଯେଇଁ ତା’ ଦୂର କରା ଏବଂ ତାକେ ଖଲ୍ମ କରାର ଜନ୍ୟ ଆମାଦେର ସଂତ୍ରବ୍ୟ ସବକିଛୁ କରା ଦରକାର।”

ଇବନେ ସାବାର ଏହି ଉକ୍କାନୀର ଫଳେ ତାର ଅନୁଚରଦେର ଏକଟି ବାହିନୀ ଗଠିତ ହେଁ ଖଲීଫାକେ ହତ୍ୟା କରାର ଜନ୍ୟ ମଦିନା ପୌଛେ। ଏସମୟ ଛିଲ ହଜ୍ଜର ମୌସୁମ। ମଦିନାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହଜ୍ଜ କରତେ ମକାଯ ଚଲେ ଯାଯା। ବିଦ୍ରୋହୀରା କତଣ୍ଟିଲା ଅଧ୍ୟୋତ୍ତିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଢ଼ କରିଯେ ଖଲීଫାର ପଦତ୍ୟାଗ ଦାୟି କରେ ଏବଂ ପୁରୋ ନଗରୀ ଘେରାଓ କରେ ରାଖେ।

ଖଲීଫା ସଠିକ ତଥ୍ୟର ଅଭାବେ ମନେ କରଲେନ ଯେ, ବିଦ୍ରୋହୀରା ତାର ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଧାନ ପଦେ ଥାକାର ବିରୋଧୀ। ଏ ଜନ୍ୟ ତିନି ଚାନନି ଯେ, ତାର ପ୍ରାଣେର ହେଫାଜତେର ଜନ୍ୟ କୋନ ମୁସଲମାନର ରଙ୍ଗପାତ ସ୍ଥାପନ କରିଲା। ତିନି ଇଛା କରଲେ ସେନାବାହିନୀ ବ୍ୟବହାର କରେ ବିଦ୍ରୋହୀଦେର ନିର୍ମଳ କରେ ଦିତେ ପାରନେନ। କିନ୍ତୁ ତିନି ରଙ୍ଗପାତ ପଛନ୍ଦ ନା କରେ ମଜଲୁମେର ନ୍ୟାୟ ଶାହାଦାଂ ବରଗକେ ଅଧ୍ୟାଧିକାର ଦିଲେନ। କିନ୍ତୁ ତବୁ ମଦିନାର ବିଶିଷ୍ଟ କରେବଜନ ସାହାବୀ ବିଶେଷ କରେ ଆଲୀ (ରାୟ)- ଏର ଉଦ୍ୟୋଗେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକଟି ବାହିନୀ ଖଲීଫାର ନିରାପତ୍ତାର ଜନ୍ୟ ମୋତାଯେନ କରା ହଲା। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ରୋହୀଦେର ତୁଳନାଯ ତାରା ଛିଲ ଖୁବଇ ନଗଣ୍ୟ ସଂଖ୍ୟକ। ଅବଶ୍ୟେ ୬୫୬ ସାଲେର ୧୭ଇ ଜୁନ ବିଦ୍ରୋହୀରା ଦେଇଲ ଟପକିଯେ ଖଲීଫାର ବାଡ଼ିତେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ କୁରାନ ଶରୀକ ପାଠରତ ଅବସ୍ଥାଯ ତାରା ନିର୍ମତାବେ ଖଲීଫାକେ ଶହୀଦ କରେ।

(୪) ୬୫୭ ଖୃଷ୍ଟାବେ (୩୭ ହିଜରୀତେ) ଜଙ୍ଗେ ଛିଫିନ ସଂଘାଟିତ ହେେଛିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଖଲීଫା ହୟରତ ଆଲୀ (ରାୟ) ଓ ମିଶରେର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଆମିର ମୋଯାବିଯାର (ରାୟ) ମଧ୍ୟେ ତୃତୀୟ ଖଲීଫା ଉସମାନ (ରାୟ)- ଏର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡେର ଦାବୀ ନିୟେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୟ। ମୂଲତଃ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଘଟନେର ଜନ୍ୟ ଇବନେ ସାବା ପଞ୍ଚଦେଶର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଓ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଚାରଣାଇ ଦାୟି।



## পরিচালকের চিঠি

আস্সামায় আলাইকুম

প্রিয় নবীন বন্ধুরা!

গ্রীতি ও শুভেচ্ছা নিবে। তোমাদের কল্যাণ, উন্নতি ও মৎস্য কামনা করি বলে মাঝে মধ্যে দু' একটা কড়া কথা বলি। এতে তোমরা দুঃখ পাবে না বরং আরও সাবধান, সতর্ক ও মনযোগী হবে বলে আশা করি। বিন্দু বিন্দু পানি মিলে যেমন সিন্ধুর সৃষ্টি হয় তেমনি তিলে তিলে জনন সম্ভব করে বিদ্যান বা আলিম হতে হয়। তাই কখনও কেউ একটি বই বা কিতাব পড়ে একদিনে বা এক বছরে আলিম হতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সময় ধরে নিয়মিত খেখাপড়া করা—প্রতিদিন কিছু কিছু ইলম অর্জন করা। অর্ধাং প্রয়োজন এর ধারা অব্যাহত রাখা। এ সঙ্গে তোমাদের জন্য খুব উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলেও প্রতিমাসে পাঁচটি প্রশ্ন রেখে পাঁচটি বিষয়ে জ্ঞানার চেষ্টার জন্য যে উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি তা একেবারে অগ্রহ্য করার মত নয়। এর জন্য থাকা চাই চেষ্টা ও আন্তরিকতা। অতএব তোমরা যারা নবীন পাতার সদস্য তারা এ ব্যাপারে আরো সক্রিয় হবে বলে আশা করি।

ওয়াসসালাম  
পরিচালক ডাইয়া

## বলতে পারো?

- ১। কার খেলাফতের সময়ে হিজরী সন প্রত্যাবর্তন করা হয়?
- ২। হিজরী সনকে কেন হিজরী সন বলা হয়?
- ৩। কার খেলাফতের সময় পবিত্র কুরআন পূর্ণস্তরপে সংকলন করে প্রকাশ করা হয়?
- ৪। কত হিজরীতে কারবালার যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
- ৫। আল্লাহর গ্যবে কওমে সূতকে উন্টিয়ে ধ্বংস করে দেয়ার পর ভূমিতে যে গভীর ও বিশাল জলাভূমির সৃষ্টি হয়েছিলো সেই গ্যবী সৃতিকে কোন নামে অবহিত করা হয়?

## সঠিক উত্তর

- ১। আমীর ফতেহ উল্লাহ সিরাজী।
- ২। ওকাজ মেলা।
- ৩। করডোভা।
- ৪। ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৫৮৯ হিজরী।
- ৫। যে দশজন সাহাবী ইস্তেকালের পূর্বে রাসূল (সা):— এর মাধ্যমে জানাতে যাওয়ার সুসংবাদ পেয়েছেন তাদেরকে আশরায়ে মুবাশশারা বলা হয়। তারা হলেন—  
(১) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) (২) হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) (৩) হযরত ওসমান গনী (রাঃ) (৪) হযরত আলী (রাঃ) (৫) হযরত তালহা (রাঃ) (৬) হযরত যুবাইর (রাঃ) (৭) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) (৮) হযরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াকাস (রাঃ) (৯) হযরত সাইদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) (১০) হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ)।

## সঠিক উত্তর দাতা

- ১ম— সাইফুল হক ইবনে আব্দুল কাদের, দারাল্ম উলুম মাদ্রাসা, মোসলমান পাড়া, খুলনা।
- ২য়— মোঃ আলমগীর হোসেন (রেহমুনাম), প্রয়ত্নে—সাইফুর রহমান (মজু), ধাপ শ্যামলী লেন, রংপুর-৫৪০০।
- ৩য়— কাজী আবু আহমদ সামস-উদ-দোহা, ২৫, সেকসার্কাস (৪৮ তলা) কলাবাগান, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।

## তোমরা সবাই নবীন মুজাহিদ

- ১৬৬। হাঃ মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ ইজহার  
পিতাঃ মুফতী ইজহারল্ল ইসলাম  
জামেয়াতুল উলুম আল-ইসলামিয়া,  
লালখান বাজার, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
- ১৬৭। মোহাম্মদ শাবির,  
পিতাঃ মরহুম ফজলুল হক,  
যোড়ামারা পাড়া, আলুপট্টি,  
বোয়ালিয়া, রাজশাহী।
- ১৬৮। মুহাম্মদ মূহাই ইবনে ইজহারল্ল ইসলাম,  
পিতাঃ মুফতী ইজহারল্ল ইসলাম,  
জামিয়াতুল উলুম আল-ইসলামিয়া  
লালখান বাজার, চট্টগ্রাম।
- ১৬৯। মোঃ আশরাফুজ্জামান রাজু,  
পিতাঃ মুল্লী আবদুল হাসিম,  
দারল্ল উলুম মাদ্রাসা,  
মোসলমানপাড়া, খুলনা।
- ১৭০। মোঃ আবু হানিফ,  
পিতাঃ শেখ আঃ মাজেদ,  
দারল্ল উলুম মাদ্রাসা,  
মোসলমানপাড়া, খুলনা।
- ১৭১। মোঃ মোকার উদিন,  
পিতাঃ হাজী মুহাম্মদ সাহেব আলী,  
দারল্ল উলুম মাদ্রাসা,  
মোসলমান পাড়া, খুলনা।
- ১৭২। মোঃ খলীলুর রহমান,  
পিতাঃ মোঃ মোজাহার আলী,  
গ্রামঃ সাগাটিয়া দঃ পাড়া,  
পোঃ নাড়ুয়া মালাহাট, গাবতলী, বগুড়া।
- ১৭৩। মোঃ সিরাজুল ইসলাম (বাছু),  
পিতাঃ মোঃ সোহরাব শিকদার,  
নব পল্লী মসজিদ শেন,  
বাড়ী নং-৪, বানরগাঁও, খুলনা।
- ১৭৪। হাফেজ মোস্তফা খালেক,  
পিতাঃ এ.টি.এম, সাইদুর রহমান,  
গ্রামঃ কাঁটাবাড়ী,  
পোঃ ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।
- ১৭৫। মোঃ ছান্দিকুর রহমান,  
পিতাঃ আছলিম আলী,  
জামেয়া মাদ্রাসীয়া দারল্ল উপুম,  
বিশ্বনাথ, সিলেট।
- ১৭৬। খন্দকার আনোয়ারল্ল কবীর,  
পিতাঃ মাওঃ সেকান্দর আলী,  
জামেয়া ইসলামিয়া দড়িটানা মাদ্রাসা,  
এইচ, এম, এস, রোড, যশোর।
- ১৭৭। মোঃ নুরল্লাহ ইবনে আব্দুল হামিদ ভুইয়া,  
প্রয়ত্নেঃ টি, এন, টি আব্দুস সহিদ ভুইয়া,  
গ্রাম ও পোঃ সৈয়দাবাদ,  
কসরা, বি-বাড়িয়া।
- ১৭৮। মোঃ মুকহেদুর রহমান,  
পিতাঃ মোঃ ইম্রাফিল ফোরম্যান,  
গ্রাম ও পোঃ শেখরনগর,  
সিরাজদিখান, মুল্লীগঞ্জ, ঢাকা।
- ১৭৯। মোঃ আলমগীর হোসেন (রেহযুনাম),  
প্রয়ত্নে-সাইফুর রহমান (মঙ্গ),  
ধাপ শ্যামলী রেলন,  
রংপুর-৫৪০০।
- ১৮০। মোহাঃ মোজাম্মেল হক,  
পিতাঃ আব্দুল খালেক,  
গ্রামঃ পূর্ববাকলিয়া ৩০নং,  
পোঃবহদুর হাট, থানাঃ চৌলগাঁও, চট্টগ্রাম।
- ১৮১। মোঃ নূরল্ল হুদা নোমান,  
পিতাঃ মোঃ গোলাম গনী,  
সেওতরপাড়া,  
থানাঃ ছাতক, সুনামগঞ্জ।
- ১৮২। মোঃ ইয়াছিন,  
পিতা, মরহুম আদম ছফী উল্লাহ,  
পাতাহড়া, পোঃ কশাবাড়ী,  
থানাঃ রামগড়, জেলাঃ খাগড়াছড়ি।
- ১৮৩। মোঃ জিয়াদুল কবির চৌধুরী,  
পিতাঃ মরহুম মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী,  
প্রয়ত্নেঃ আকবর চৌধুরী বাড়ী,  
আজাদীবাজার, ধর্মপুর, ফটিকছড়ি।
- ১৮৪। খন্দকার মাহফুজুর রহমান,  
পিতাঃ খন্দকার খাইরল্ল ইসলাম,  
রংম নং-১০৭, কবি আলাওল হল,  
বায়তুলআমান শাখা ফরিদপুর টেকঃইনঃ।
- ১৮৫। মোঃ সিরাজুল ইসলাম কিশোরগঞ্জ,  
পিতাঃ আব্দুল আহাদ,  
গহরপুর মাদ্রাসা,  
পোঃ গহরপুর, সিলেট।
- ১৮৬। মোঃ শামীম আহমদ (রফিব),  
পিতাঃ আব্দুল মোতালিব,  
বি, এ, আর, আই, বাসা নং সি-  
১১-এ, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

### নবীন মুজাহিদদের সদস্য কুপন

নাম	বয়স
পিতা	শ্রেণী
পূর্ণ ঠিকানা	

আমার বয়স ১৮ বছরের কম। আমি এই পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। নবীন মুজাহিদদের কাফেলায় সদস্য হতে আগ্রহী। কুরআনের আলোকে জীবন গড়তে অংগীকারাবদ্ধ। এই পত্রিকার জন্য প্রতি মাসে অন্তত একজন করে পাঠক সংঘর্ষ করব।

বাক্স

## বিদ্যালয়ী মুজাহিদের তৎপৰতা

### ইউরোপের বুকে দ্বিতীয় একটি মুসলিম রাষ্ট্রের উত্থান

(নিউইয়র্ক, পি, টি, আই) ইউরোপে আরো একটি মুসলিম রাষ্ট্রের উত্থান ঘটেছে। এটি হল সাবেক যুগোশ্চিয়ার প্রদেশ মাকদুনিয়া (মেসিডোনিয়া)। সম্পত্তি দেশটি জাতিসংঘের ১৮১তম সদস্যপদ লাভ করেছে। ইতি পূর্বে ১৯৯২ সালের মে মাসে বসনিয়া-হারজেগোভিনা জাতিসংঘের প্রথম ইউরোপীয় মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে সদস্যপদ লাভ করে।

৬ষ্ঠ শতাব্দীতে স্লোভেনিয়ান সম্প্রদায় মাকদুনিয়ায় বসতি স্থাপন করে। ১৩৫৫ খ্রিস্টাব্দে মাকদুনিয়া তুর্কী মুসলিম শাসনের অধীনে আসে। ১৯১২-১৯১৩ সালে অনুষ্ঠিত বলকান যুদ্ধের পর তুর্কী মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে এবং সার্বিয়ার মাকদুনিয়া দখল করে নেয়। মাকদুনিয়ার উত্তরে সার্বিয়া ও কসোভো, পূর্বে বুকোগেরিয়া, দক্ষিণে গ্রীস ও পশ্চিমে আলবেনিয়া।

আয়তন ১৫,৭১৩ বর্গ কিলোমিটার। লোক সংখ্যা ২০ লাখ। শতকরা ৬০ ভাগ মুসলমান। যুগোশ্চিয়ার সার্ব সম্প্রদায় মাকদুনিয়ার মুসলমানদের উৎখাত করে তাকে সার্বিয়ার অন্তর্ভুক্ত করতে আগ্রহী। সে জন্য তারা সেখানে ইতিমধ্যে অপ তৎপৰতা শুরু করেছে।

১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাকদুনিয়া যুগোশ্চিয়া থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। গ্রীসের আপত্তির কারণে ইউরোপীয় জোট দেশটিকে স্বীকৃতি দিতে বিলম্ব করে।

গ্রীসের আপত্তির কারণ তার দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশের নামও মাকদুনিয়া। কাজেই মাকদুনিয়া এই নামে স্বীকৃতি পেলে তা তার দক্ষিণ অঞ্চলের জন্য সংকট সৃষ্টি করত পারে। দুই অঞ্চল মিলিত হয়ে এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা পূর্বে এই দুটি এলাকা একত্রিত ছিল। ভাষা, ধর্ম ও

জাতিগতভাবে উভয় অঞ্চলের মধ্যে প্রচুর মিল রয়েছে। শেষ পর্যন্ত ১৯৯২ সালের ১১ ডিসেম্বর মাকদুনিয়ার পার্লামেন্ট দেশের নাম পরিবর্তন করে ঝোপকী মাকদুনিয়া রাখে। তবে এখনও অন্যান্য রাষ্ট্রের মত তাকে জাতিসংঘের সদর দণ্ডের সামনে মাকদুনিয়ায় পতাকা উত্তোলন করতে দেয়া হয়নি।

### দশ হাজার নকল মুজাহিদ তৈরীর ভারতীয় পরিকল্পনা

(দিল্লী, পি, টি, আই) ভারত জবর দখলকৃত কাশ্মীরের স্বাধীনতা সংগ্রাম নস্যাত করার উদ্দেশ্যে ইসরাইলী মোসাদের পরামর্শে প্রচার প্রোপাগাণ্ডার এক নয়া উদ্যোগ নিয়েছে। পি, টি, আই গোপন স্থলে প্রাণ খবরের উত্তৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে, শীঘ্ৰই ভারতীয় সরকার বিপুল সংখ্যক কাশ্মীরী মুজাহিদদের অন্তর্সহ সরকারী সৈন্যদের কাছে আত্মসম্পর্কের খবর ফলাও করে অল ইভিয়া রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচার করবে। এই উদ্দেশ্যে দশ হাজার ভারতীয় নওজোয়ানকে অন্ত ও পোশাক পরিয়ে নকল মুজাহিদ সাজানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তারা ডিন ডির অঞ্চলে বিশেষ অনুষ্ঠানে সরকারী কর্মচারীদের কাছে অন্তর্সহ আত্মসম্পর্ক করবে। তাদের এই নাটকীয় অনুষ্ঠান ভারতীয় টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হবে। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বেও ভারতীয় গুঙ্গচর সংস্থা “র” কাশ্মীরী হিস্পুদেরকে অন্ত দিয়ে নকল মুজাহিদ সাজিয়েছিলো, যারা জনসাধারণকে নানা ভাবে উৎগোড়ন করে মুজাহিদদের ভাবমূর্তি নস্যাত করার অপচেষ্টা করেছে। দশ হাজার নওজোয়ানকে অন্ত সমর্পন অনুষ্ঠানের মহড়া ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। এই প্রদর্শনীর পর সাবেক মুখ্য মন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাহ ও তার অনুচর গোলাম রসূলকে কাশ্মীরের শাসক বানানো হবে। উল্লেখ্য যে, ভারতের অভ্যন্তরে কাশ্মীর সম্পর্কে চরম হতাশা বিবাজ করেছে। সাধারণ জনগণকে আস্ত্র করার জন্য এই অভিনব কৌশল

প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

### আফগান মুজাহিদদের আক্রমণ কাশ্মীরে সতের জন ভারতীয় সৈন্য নিহত

কাশ্মীরের অন্যতম মুজাহিদ কমাণ্ডার মকবুল আলাই ও চার জন আফগান মুজাহিদ দু'জন অফিসারসহ সতেরজন ভারতীয় সৈন্য হত্যা করে শাহাদাত বরণ করেন। এদিন বটগামে ভারতীয় সৈন্যরা ঢেক ডাউনের সময় কাশ্মীরী মহিলাদের ওপর অমানবিক নির্যাতন শুরু করে। নির্যাতিত মহিলাদের কর্তৃণ আর্তনাদ শুনে বীর মুজাহিদ আলাই চারজন আফগান মুজাহিদসহ গোপন অবস্থান থেকে বের হয়ে ভারতীয় হায়েনাদের ওপর অর্তকিত হামলা চালায়। এতে ঘটনাস্থলেই সতেরজন ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়। পরে অতিরিক্ত সৈন্যরা এসে মুজাহিদদের ঘরে ফেলে। তাদের সাথে ঘটাখানেক সড়াইয়ের পর মুজাহিদরা শহাদাত বরণ করেন। মকবুল আলাই জিহাদী আন্দোলনের প্রথম সারির একজন নেতা এবং হেজুবুল মুজাহিদের ডিভিশনাল কমাণ্ডার ছিলেন। আবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি অনেক বছর জেলে ও ইটার্গেশন সেন্টারে অতি-বাহিত করেন।

১৯৮৭ সালে ভারতীয় সরকার ইলেকশনে নজীর বিহুন কারচুপির মাধ্যমে মুসলিম সমর্থিত প্রার্থীদের পরাজিত করে। হতাশ কাশ্মীরী নওজোয়ানরা তখন থেকেই সশস্ত্র জিহাদের সূচনা করেন। জিহাদ শুরু করা ও নওজোয়ানদের সংগৰবন্ধ করতে মরহুম শহীদ মকবুল আলাই বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

কাশ্মীরী জিহাদের সবচেয়ে বড় অভিযান যা’ ১৯৮৮ সনে ট্রাঙ্গী অভিযান নামে খ্যাতি লাভ করেছিল তা’ মরহুম মকবুল আলাইয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিলো। এই সড়াইয়ে তার দেহে ছাঁচ গুলি বিন্দ হয়।

তিনি সর্বোমোট চারবার কন্ট্রোল লাইন অতিক্রম করে আয়াদ কাশীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। আফগানিস্তানে খোস্ত সেটেরে মরহুম মকবুল আলাই উচ্চতর গেরিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং এই সেটেরে সশস্ত্র সড়াইয়ে অংশ নেন। বায় যোগ্যতা, মনোবল ও উচ্চতর চরিত্রের জন্যে সকল প্রশ্নের মুজাহিদের নিকট তিনি সমানভাবে গ্রহণযোগ্য ছিলেন। সড়াইয়ে শাহাদত প্রাপ্ত অপর চারজন আফগান মুজাহিদের পূর্ণ পরিচয় জানা যায়নি।

অবশেষে আলজেরিয়া ইসলাম ঠেকানোর পর্যায়ে

ইসলামী পোশাক নিষিদ্ধ ঘোষণা

আলজেরিয়ার গণভোটে ইসলামী সালতেশন ফন্টের নিচিত, বিজয়কে ঠেকানোর জন্য যে সকল ঘৃণ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়ায় সেখানকার তৈহিদী জনতা ত্রুমান্বয়ে সশস্ত্র জিহাদের প্রতি অগ্রসর হচ্ছে।

এক খবরে প্রকাশ, গত চার মাসের সড়াইয়ে ২০০ জন স্যালতেশন কর্মী ও ৬০ জন সরকারী সেন্য নিহত হয়েছে। গত বছর ফেব্রুয়ারী মাসে জবর দখলকারী সামরিক সরকারের জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর অসংখ্য ইসলাম বিরোধী আইন তৈরি করে ধর্মপ্রাণ মুসলিম আলজেরিয়ানদের নানা ভাবে সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সর্বশেষ খবর অনুযায়ী আলজেরিয়ায় ইসলামী পোশাক পরিধান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এখন থেকে কোন সরকারী কর্মচারী ইসলামী পোশাক পরিধান করতে পারবে না এবং ধর্মপ্রাণ মুসলিম মহিলারাও বোরকা পরিধান করতে পারবে না। উল্লেখ থাকে যে, ভৌত সামরিক সরকার ইতিপূর্বে আলজেরিয়ানদের জন্য অফগান মুজাহিদের পোশাক পরিধান নিষিদ্ধ করে ছিল। যা আলজেরিয়ান নওজোয়ানদের নিকট অত্যন্ত প্রিয় পোশাক হিসাবে গ্রহণীয় ছিলো।

মুজাহিদের অতক্তি হামলায় কাশীরে ভারতীয়

কর্ণেল ও মেজর জেনারেল হতাহত

(১৯ই জুন) ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল ইন্সুর্মা মুজাহিদের এক

অতক্তি হামলায় মারাত্মক আহত হয়েছে। ডেমেস অব আমেরিকার খবরে বলা হয়, সেনাবাহিনীর একটি ফ্র্যাঙ্ক সোপুর শহরের উন্নরের একটি গ্রামে তল্লাশী অভিযান শেষে ফেরার পথে মুজাহিদের অতক্তি হামলার শিকার হয়। এই হালমলায় একজন কর্ণেল নিহত ও মেজর জেনারেল ইন্সুর্মা গুলিবিদ্ধ হলে মারাত্মক ভাবে আহত হয়। আকাশ বাণীর খবরে বলা হয়, মেজর জেনারেলের আঘাত গুরুতর হলেও তার বাঁচার সংস্কারণা রয়েছে। শ্রীনগর থেকে এ, এফ, পির আর এক খবরে জানা যায়, গত রোববার ভারতীয় সেন্য ও আধা সামরিক বাহিনীর সদস্যরা স্বাধীনতাকামী জঙ্গী মুজাহিদের বিরুদ্ধে সোপুর শহরে এক সম্প্রিলিত অভিযান পরিচালনা করে। সোপুর শহরের সকল গতিপথে সেন্যরা অবস্থান নিয়ে ঘরে ঘরে তল্লাশী অভিযান চালায়। সেন্যরা সামরিকভাবে শহরের টেলিফোন ও পানি সরবরাহ বিছিন্ন করে দেয়। তল্লাশী অভিযানের খবরে পূর্বেই অবগত হয়ে মুজাহিদরা শহর পরিত্যাগ করে। ফলে কোন রূপ প্রতিরোধ হাড়াই ভারতীয় নিরাপত্তা বিভাগের তল্লাশী অভিযান শেষ হয়। নয়া দিয়ী থেকে এ, এফ, পির খবরে আরও জানা যায় যে, ভারতীয় সেনা বাহিনী গত বৃহস্পতিবার মতি সিং নামক একজন শিখকে শ্রীনগর থেকে গ্রেফতার করেছে। তিনি কাশীর ও পাঞ্জাবের মুজাহিদ ও শিখ জঙ্গিবাদীদের মধ্যে সময়ব্যবস্থা সাধন করতেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন মুখ্যাপ্ত নেনেন, এটা একটা বড় ধরনের সাফল্য।

প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অধিকৃত কাশীরে প্রবেশের অপেক্ষায় আছে।

ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে আটক মুজাহিদের টর্চারিং করে জানা গেছে, কাশীর উপত্যাকা, জন্ম দোদা ও পুষ জেলা থেকে আগত এক হাজার তিনশত মহিলাসহ ১৫ হাজার মুজাহিদ ইতিমধ্যে সামরিক ট্রেনিং গ্রহণ করেছে। আয়াদ কাশীরে মহিলাদের ৬টি প্রশিক্ষণ শিবির রয়েছে। এসব মহিলাদের কুদু আঘেয়ান্ত্র ও বিশ্বের ব্যবহার শিখানো হচ্ছে।

✓ পরিত্র কাবা নিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী ও ইহুদীবাদীদের ষড়যন্ত্র

ইসলামের দ্বিতীয় কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাসের ওপর আধিপত্য বিভারকারী ইহুদী চক্র এবার বাবরী মসজিদ ধ্বংসকারী ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সাথে মিলে পরিত্র কাবা শরীফ বায়তুল্মাহ দখলের ষড়যন্ত্রে লিঙ্গ হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিশ্বস্তের উদ্ভৃতি দিয়ে একটি বাংলা দৈনিক এমর্মে চাঞ্চল্যকর খবর পরিবেশন করেছে। ভারতের মুসলিম বিদ্বেষী ও বাবরী মসজিদ ধ্বংসের মূল শক্তি রাষ্ট্রীয় বংশ সেবক সংঘ সম্প্রতি আরব দেশ সমূহে কর্মসূত হিন্দুদের কাছে হিস্তি ভাষায় একটি লিফলেট প্রচার করেছে। এই লিফলেটে পরিত্র কাবা শরীফকে মুসলমানদের কবল থেকে মুক্ত করে মহাদেবের মন্দির বানানোর আহবান জানানো হয়েছে। সেই সাথে ইসরাইলী ইহুদী চক্রকে বৃহত্তর ইসরাইল রাষ্ট্র কার্যমের ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগীতা প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, বৃহত্তর ইসরাইল পরিকল্পনা, মানচিত্রে ফিলিস্তিন, সিরিয়া, জর্দান, মিসর খাইবার ও পরিত্র মদীনা নগরীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাদ বাকী আরব যেহেতু ইসলামের অভ্যন্তরে পূর্বে মুক্তি পূজারীদের আবাস ভূমি ছিল সেহেতু একে বৃহত্তর রামরাজ্যের অন্তর্ভুক্তির পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। তাদের ধৃষ্টতা এত বেড়ে গেছে যে, পরিত্র বায়তুল্মাহকে তারা চৌদশত বছর পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া মুর্তি

সমূহ পুনঃস্থাপনের দুঃসাহস পোষন করছে।

আল্লাহর ফেরেশতাগণের দ্বারা নির্মিত বায়তুল্লাহর স্থানে ইবরাহীম আলাইহিসালাম কাবা ঘর নির্মান করেন। তিনি মৃত্তি বিখ্যাসী ও একত্বাদের বিশ্বাসী ছিলেন। পরবর্তী সময়ে পৌত্রলিক আরবরা কাবার উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে স্থানে মৃত্তি স্থাপন করে। আল্লাহর শেষ নবী ইয়রত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর সকল মৃত্তি ভেঙ্গে পরিত্র কাবা শরীফে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের ব্যবস্থা করেন। বিশ্বের কোটি কোটি মুসল্মান এই ঘর জিয়ারত করে হজ্জ ও উমরা পালন করে থাকে।

শ্রীলংকার একজন মুসলিম ধর্মীয় নেতা সম্পত্তি বোধাইয়ের বোমা বিক্ষেপণের জন ইসরাইলী গুপ্তচর সংহ্যা মোসাদকে দায়ী করেন। তার ভাষ্য অনুযায়ী ইসরাইল এই বোমা বিক্ষেপণের দায়িত্ব মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিয়ে সুকোশলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধানোর পায়তারা করছে।

এবং তাদের ইসলাম বিরোধী চক্রান্তে সম্প্রদায়ীক হিন্দুশক্তিকে কাজে লাগাতে চাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, শ্রীলংকায় ইসরাইলী দুতাবাস স্থাপনের পরপরই স্থানকার হিন্দু তালিম ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গা ব্যাপক আকার ধারণ করে।

✓ **স্বাধীন চেসনিয়া প্রজাতন্ত্রে রুশদের নয়া বড়ব্যক্তি**

রাশিয়া থেকে সদ্য স্বাধীনতা ঘোষিত দক্ষিণাঞ্চলীয় মুসলিম প্রজাতন্ত্র চেসনিয়া রুশদের নয়া বড়ব্যক্তের শীকার হয়েছে। গণভোটে স্বাধীনতার পক্ষে বিপুল ভোট পাওয়ার পর রুশ সরকার স্থানের ছোট ছেট অঞ্চলগুলিকে চেসনিয়া প্রজাতন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। মুসলিম চেসনিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট দোদার দুদায়েভ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর হশিয়ারী উকারণ করেছেন। ইতিমধ্যে চেসনিয়ার রাজধানী মোজনির উত্তর অঞ্চলের নাতারেসনিয়াকে চেসনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চলছে। নাতারেসনিয়া একটি

অতি ক্ষুদ্র অঞ্চল। যার জনসংখ্যা মাত্র ৪৬ হাজার। এই ক্ষুদ্র অঞ্চলের নেতা অভূতুর খানোভ রুশদের সহযোগিতায় আঞ্চলিক ক্ষমতা গ্রহণ করে সরকারী তিনটি সাজোয়া যান আটক করেছে। ওদারমেস ও ইউরাস মারতান নামে অপর দুটি অঞ্চলও প্রেসিডেন্ট দুদায়েভের বিরোধীতা করেছে। উল্লেখ্য ১৯৯১ সালের অক্টোবর মাসে দুদায়েভ চেসনিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

গণুন থেকে এফএপি জার্জিয়ার আবখাজ মুসলিম গেরিলারা গত বুধবার আবখাজিয়ার রাজধানী সুখুমিতে গোলাবর্ষণ করলে কমপক্ষে ৩জন জার্জিয়ান নিহত ও ১৬ জন আহত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জার্জিয়া থেকে আবখাজিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে প্রতিদিন স্থানে লড়াই চলছে। জার্জিয়ার প্রেসিডেন্ট এডয়ার্ড শেভোর্নার্জে বলেছেন, স্বাধীনতাকামী মুসলিম যোদ্ধারা যুদ্ধ বিপরিতে সম্মত হয়েছে। আবখাজিয়ার রাজধানী সুখুমি ছাড়া বাকি অংশ স্বাধীনতাকামীদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

গ্রন্থনামঃ ফারাক হাসান

## ইপানি বাত প্যারালাইসিস চর্মরোগ এ্যালার্জি

- ① গ্যাষ্টিক, আলচার, গলা ও বুকজ্বালা, লিভারদোষ, রক্ত আমাশয়, পুরাতন আমের দোষ।
- ② প্রস্তাবে ক্ষয়, ঘনঘন প্রস্তাব, (ডায়াবেটিস), প্রস্তাবের জ্বালা পোড়া, কিটকিট কামড় মারা।
- ③ স্বপ্ন দোষ, শ্রক্র তারল্য, পুরুষত্বহীনতা, লিঙ্গে দোষ।
- ④ সিফিলিস, গনোরিয়া, প্রস্তাবের রাস্তা দিয়া রক্ত পুঁজ যাওয়া, ধ্বজভঙ্গ।

### স্ত্রী ব্যাধি

- ⑤ শ্বেত পদর (লিকুরিয়া), রক্ত প্রদ, বাধক বেদনা, যে কোন কারিণে মাসিক বন্ধ, সুতিকা, শুকনা সুতি, নারিত্বহীনতা, ১০/১৫ বৎসর বিবাহ হয়েছে আজও সন্তান হয় নাই তাদের সন্তান লাভ।
- ⑥ অর্শ, গেজ, তগন্দর, শ্বেতী, সূলী, তন, মেস্তা, কানপাঁকা, কানে কম শোনা, চক্রোগ, মষ্টিকের দুর্বলতা, মৃগী, পাগল, অকাল চুল পাকা ও উঠা ইত্যাদিতে নিচয়তা।  
উপরে বর্ণিত রোগে যারা আক্রান্ত তাদের সেবা চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রথম শ্রেণীর হাকিম হাফেজ মেছবাহ উদ্দিনের সহিত নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগঃ  
হাকিম হাফেজ মেছবাহ উদ্দিন

## গওহার ইউনানী ঔষধালয়

সেকশন-১২, ব্লক ডি (পানির ট্যাংকি সংলগ্ন) মিরপুর, ঢাকা-১২১২২

## মোসিকিৎসা দেওয়া ব্যবস্থা

ইচ্ছা শক্তি প্রবল, ক্রিয়া ক্ষেত্রে দুর্বল, তাদের জন্য আমরা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গাছ-গাছড়ার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় স্বর্ণ, রৌপ্য, কস্তুরী, মোহরা, মিরপুর, পারদ, জাফরান ও বিভিন্ন প্রকার জারণসহ দেড় শতাধিক মূল্যবান দ্রব্যাদির দ্বারা ঔষধ তৈরী করিয়া থাকি। এ ঔষধ দ্বারা বিগত বছরগুলোতে সুনামের সহিত চিকিৎসা করিয়া আসিতেছি এবং রক্ষ লক্ষ লোক দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মৃত্যি পাইয়াছে। যাহারা বিভিন্ন গোপন জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত, বিভিন্ন চিকিৎসায় ব্যর্থ, লজ্জায় সংকোচে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক ও বিবাহের পর অশান্তিতে দিন যাপন করিতেছেন। লজ্জায় কাহাকেও প্রকাশ করিতেছেন না, তাহাদিগকে জীবনের শেষ চিকিৎসা মনে করে এই চিকিৎসা গ্রহণ করার আহবান জানাইতেছি। আমাদের তৈরী ঔষধ একবার মাত্র পরীক্ষা করুন। বিফলে মূল্য ফেরত দেওয়া হয়।

## মাথায় টাক

যাহাদের মাথায় চুল নেই অথবা চুল পড়ে যাচ্ছে অথবা চুল কম, চুল আছে কিন্তু চুলে আকর্ষণীয়তা নেই, তাদের জন্য মঞ্চট ওয়েল অত্যন্ত কার্যকরী। ইহা ব্যবহারে চুল পড়া বন্ধ করে, চুলকে আকর্ষণীয় করে এবং যাহাদের মাথায় টাক পরে গেছে মাত্র ১৫ দিন ব্যবহারে চুল আবার গজাবে। ইহা আমাদের অনেক পরীক্ষিত ও পমাণিত।

## কি কি মোড়োর চিকিৎসা করা হয়

খোদার ফজলে জোর করিয়া বলিতে পারি বঙ্গ হারবাল কমপ্লেক্স-এর মহোষধ ব্যবহার করিলে যে কোন প্রকার ধাতুষ্ঠ রোগ হউক না কেন সমূলে বিনাশ করিবে। যাহাদের বারবার স্বপ্নদোষ, ঘৌবনে নানা অত্যাচারে ধাতু বিকৃত হইয়াছে, কোমরে বেদনা, ক্ষুধামন্দা, শরীর দুর্বল, মন্তিক হীনবল, শক্তি হ্রাস, পুঁজ ও ধাতুর ভীষণ জ্বালা, প্রস্তাবের টনটনি, প্রসাব আটকাইয়া যাওয়ায় জ্বালাপোড়া, ফেঁটা ফেঁটা প্রসাব, ঘোলাবৎ প্রস্তাব, বহুমুত্র রেতৎপাত, কোষ্ঠ কাঠিন্য, ঘুষঘুষে জ্বর, হাত-পা জ্বালা ইত্যাদি দুরারোগ্য রোগের মত অবস্থায় থাকিয়া বহুদিন যাবৎ কষ্ট পাইতেছেন-তাহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, অতি সহসা আমার এই ভেজ ঔষধ সেবন করুন। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত রোগ সমূলে বিনাশ করিয়া ৬০ বছরের বৃদ্ধকেও ২৫ বছরের নব্য যুবকের ন্যায় শক্তিশালী করিবে ইনশাল্লাহ। এই ঔষধ স্ত্রীলোকের সুতিকা, শ্রেতৎপ্রদর, হাত পা জ্বালাপোড়া, মুখে অরুচি, বদহজম, অতিরিক্তভাবে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ইত্যাদি দুরারোগ্য স্ত্রীরোগের মন্ত্রশক্তির মত কাজ করিয়া দুই সপ্তাহে আরোগ্য লাভ হইবে। ইহা ছাড়াও ৮০ প্রকার বাতের টিকিংসা করা হয়। প্রযোজনে ৬ জন হাকীম ও কবিরাজ নিয়ে বোর্ড বসায়ে চিকিৎসা করা হয়।

## বঙ্গ হারবাল কমপ্লেক্স

৫৯, নিউ ইঞ্জাইন রোড,

বাংলা মটর, ঢাকা

মেঘনা পেট্রোল পাম্পের ৫০ গজ গলির ভিতর

শুক্রবারসহ প্রতিদিন সকাল ৯টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকে

আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সূতী, স্যানডাক্স,  
নায়লন ও টারকিস মোজা প্রস্তুতকারক



Chand  
SOCKS



চান্দ হোসিয়ারী মিলস

৩০, শাখারী নগর লেন, ফরিদাবাদ, ঢাকা-১২০৮